গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৬ সংখ্যা ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

গণহত্যাকারী শ্যারনকে নির্লজ্জ অভ্যর্থনা

প্যালেস্টাইনের অসংখ্য নিরপরাধ শিশু-বৃদ্ধ-নারীর রক্তের দাগ হাতে নিয়েই ইজরায়েল প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল শ্যারন ভারত সরকারের সাদর আমন্ত্রণে এদেশ সফর করে গেলেন। লাল কার্পেট বিছিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। স্বভাবতই প্যালেস্টাইনের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি এতদিন ভারত যে সমর্থন জানিয়ে এসেছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ইজরায়েলি অন্যায় দখলদারির বিরুদ্ধেই তো প্যালেস্টাইনের জনগণের সংগ্রাম। নিজেদের মাতৃভূমিতেই নিজস্ব রাষ্ট্র পাওয়ার মৌলিক অধিকার চেয়ে গত ৫০ বছর ধরে প্যালেস্টাইনের জনগণ হাজারে হাজারে রক্ত ঝরিয়ে, প্রাণ দিয়ে লড়াই করছে। কত হাজার শহীদ হয়েছে তার হিসাব নির্দিষ্ট করে যারা হত্যা করেছে তারাও বলতে পারবে না। প্যালেস্টাইনের জনগণের এই ন্যায্য দাবিকে বুলডোজার, ট্যাঙ্ক, ক্ষেপণাস্ত্র ও বন্দুকের জোরে যে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত বা বিশ্বজনমত কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করছে না, তাকে রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা দিলে, শুধু প্যালেস্টাইনের জনগণ নয়, বিশ্বের যেখানে যারাই ন্যায়ের জন্য, মুক্তির জন্য লড়ছে, তাদের প্রতি বেইমানি করা হয়। শুধু তাই নয়, খোদ ভারতবর্ষের জনগণের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবকেও ধূলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঠিক সেটাই করেছে। শ্যারনকে ভারতে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল অনেকদিন আগেই। দেশের

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৩ বছরের আমেরিকান তরুণী র‍্যাচেল কোরি, শান্তি আন্দোলনের কর্মী। গাজা ভূখণ্ডের রাফায় প্যালেস্তাইন উদ্বাস্তু শিবিরে গত ১৬ মার্চ উদ্যত ইজরায়েলি বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। শ্যারনের বুলডোজার তাঁকে রেহাই দেয়নি, পিষে দিয়েছিল। শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে র‍্যাচেল। (ডাইনে) মৃত্যুপথযাত্রী র‍্যাচেলকে নিয়ে সহকর্মীরা।

পুলিশের গুলিতে হত্যার প্রতিবাদে দুর্গাপুর বন্‌ধ

৪ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুরের গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল ভিড়িঙ্গী মোড়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ, প্রতিবাদী জনতার ওপর বামফ্রন্টের পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে আরও তিনজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে দেখিয়ে দিল এ-রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার আজ তলানিতে ঠেকেছে। পুলিশ এভাবে গুলি চালাতে পেরেছে, কারণ তারা জানে — সরকার তাদের সমর্থন করবে, মানুষ খুন করেও কোন শাস্তি তাদের পেতে হবে না। শাসকদলকে সেবা করে তারা পার পেয়ে যাবে।

বেপরোয়া পুলিশি বর্বরতা এবং মর্মান্তিক মৃত্যুতে দোষী পুলিশের শাস্তি, মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থার দাবিতে মর্মান্তিক ঘটনার পরপরই সর্বপ্রথম এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকেই বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়। পরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তারও পরে কংগ্রেস বন্‌ধ ডেকেছিল। ধৃত ব্যক্তিদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিও তোলা হয়েছে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দুর্গাপুরের মানুষ বন্‌ধ সফল করেছেন। ওই দিন দলের ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও জেলা জুড়ে ছাত্র প্রতিবাদ দিবস পালন করে।

পথ দুর্ঘটনায় গরিব ফুচকা বিক্রেতা বচ্চন সিং ও তাঁর দুই সন্তান রাখী ও রাণার মর্মান্তিক মৃত্যু আদৌ আকস্মিক ঘটনা নয়। সরকার ও প্রশাসনের ক্ষমাহীন অবহেলাই এই দুর্ঘটনা ডেকে এনেছে। দুর্গাপুরের জনবহুল এবং যানবহুল জিটি রোডের গুরুত্বপূর্ণ এই মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল বসানোর সামান্য অথচ অতি প্রয়োজনীয় দাবিটি পুলিশ-প্রশাসন দীর্ঘদিন উপেক্ষা করে চলেছে। ফলে পথচারীদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করতে হচ্ছে। এ অবস্থায় যেকোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক এবং ৪ সেপ্টেম্বর তাই ঘটেছে, যার পুরো দায়িত্ব প্রশাসন ও সরকারের।

চোখের ওপর একজন পিতা ও দুই সন্তানকে চাকার তলায় পিষে যেতে দেখে ক্ষুব্ধ মানুষ পথে নামেন। পুলিশ আসে অস্ত্র হাতে। ব্রিটিশ ও কংগ্রেসের মতোই সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের আমলেও শাসকদল ও প্রশাসনের চোখে প্রতিবাদী জনতা মানেই 'তাণ্ডবকারী, সমাজবিরোধী, দুর্বৃত্ত'। পরদিন ৫ সেপ্টেম্বর গণশক্তি, অন্যান্য শাসক বুর্জোয়া দলগুলির

চারের পাতায় দেখুন

মালদার পঞ্চানন্দপুর

বিধ্বস্ত ভাঙ্গন দুর্গত এলাকায় চাই — আরও শত শত নহিরুদ্দিন

মালদা জেলার নদীভাঙ্গনের সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। হাজার হাজার পরিবার ভিটেমাটি হারিয়ে হয়ে যাচ্ছে সর্বহারা। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বাস্তবিকই ভিখারিতে পর্যবসিত হচ্ছে। স্কুল, অফিস, মন্দির, মসজিদ, কিছুরই রেহাই নেই গঙ্গার প্রবল ভাঙ্গনে। মানিকচক, কালিয়াচক ২নং ব্লকের পঞ্চানন্দপুর সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল তলিয়ে যাচ্ছে নদীগর্ভে। ভাঙ্গনের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের জীবনজীবিকার আশা ভরসাও যাচ্ছে তলিয়ে। খোলা আকাশের নীচে বসবাসকারী সেই সবখোয়ানো মানুষের চোখের জলের উচ্ছ্বাস সংবাদপত্রের পাতাকে ভেজায় না। হাঁসমুরগী, গরু, ছাগল, টিনের টুকরো, টালি সাদামাটা তোরঙ্গ হাঁড়িকুড়ি নিয়ে ছন্নছাড়া নরনারীর দুচোখে শুধুই শূন্যতা। এমনটাই হয় বছরের পর বছর। রাস্তার দুধারে পুরনো বাস্তুহারা সম্বলহীন মানুষগুলোর বাঁশ বা পাটকাঠির বেড়া দেওয়া ঝুপড়িগুলি দেখলে বোঝাই যায় একই ট্রাডিশন চলছে, চলে আসছে ফি বছর। নতুন নতুন উদ্বাস্তু জননীর কোলের শিশুরা জানেনা কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল তাদের জীবনে।

এই ভাঙ্গনের ভয়াবহতা হয়ে ওঠে দর্শনীয়। নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষ যায় টাটাসুমো-এ্যামবাসাডার, বাস রিজার্ভ করে। ক্যামেরাও যায়। ছবিতে ধরা পড়ে ভয়াবহ সর্বনাশের প্রাণহীন হৃদয়হীন ছবি। সবাই যে মজা দেখতে যায় এমন নয়। সহানুভূতি নিয়ে দুর্দশার হিসেব নিকেশ করতেও ছোটে বহু মানুষ। তাদের চোখ জলে ভেজে। ওখানেও গেছেন সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, মন্ত্রী, আমলা, গ্রামপঞ্চায়েতের মাতব্বর, জেলা পরিষদের কর্তারা। কিন্তু মানুষের পাশে দাঁড়ায় একমাত্র সাধারণ মানুষই। তারা খাদ্য দেয়। পোষাক দেয়। দেয় ভালবাসা। ওনারা যান — যেতে হয়। রুটিন কাজ। ফি বছর। এমন সময়।

মালদার জেলা শাসক বলেন — প্রচুর ত্রাণ। অভাব

দুয়ের পাতায় দেখুন

৯০৫টি এম বি বি এস আসন বহাল রইল ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপেই

মেডিকেল শিক্ষায় ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি ও ক্যাপিটেশন ফি চালু করার সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রতিরোধ করতে দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলন ন্যায্য দাবি আদায়ে সফল হয়েছে। মেডিকেল কাউন্সেলিং-এ সরকার যে ৭০টি আসন ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে ছাত্র ভর্তির জন্য ফাঁকা রেখেছিল, দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের চাপে মাথা নত করে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। একই সঙ্গে বর্ধিত টিউশন ফি মাসিক ১০০০ টাকা থেকে কমে ৭৫০ টাকা হয়েছে এবং হোস্টেল ফি মাসিক ৫০০ টাকা তারা এখনও ঘোষণা করতেই পারেনি।

গত ২০০২ সালের মাঝামাঝি রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল, এম বি বি এস-এ মাসিক ১০০০ টাকা টিউশন এবং ৫০০ টাকা হোস্টেল ফি নেওয়া হবে এবং ১৫ শতাংশ আসন ক্যাপিটেশনে ভর্তি করা হবে। প্রতিবাদে মুখর ছাত্রছাত্রীরা এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে ২০ নভেম্বর, ২০০২ আর জি কর মেডিকেল কলেজে এক কনভেনশনের মাধ্যমে গড়ে তোলে 'অল বেঙ্গল মেডিকেল স্টুডেন্টস্ এ্যাকশান ফোরাম'। ৩ ডিসেম্বর ২০০২, দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রীর সুশৃঙ্খল মিছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেয়। ঐ বিক্ষোভে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনির্ভাসিটি অব হেল্‌থ সায়েন্স এ্যাক্ট' পোড়ানো হয়।

ডাঃ সমর মিত্র, ডাঃ পি কে সেন, ডাঃ কানাইলাল মুখার্জী সহ ৩২ জন প্রথিতযশা অধ্যাপক চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রীকে ফি বৃদ্ধি ও ক্যাপিটেশনের বিরোধিতা করে চিঠি দেন।

ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান স্বনামধন্য চিকিৎসক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা। ২৭ জুন ২০০৩ সফল হয় ফি-বৃদ্ধি বিরোধী কনভেনশন। ৮ জুলাই, মেডিকেল কলেজে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ ও আন্দোলনকারী-দের গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারের অনড় অবস্থান আন্দোলনের তীব্রতাই বাড়ায় মাত্র। ১৫ জুলাই সফল হয় ডাক্তার-ছাত্রছাত্রীদের অনশন অবস্থান। ১৮ জুলাই সর্বাত্মক সারা বাংলা মেডিকেল ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ২৪ জুলাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এ আই ডি এস ও-র ডাকে ২৯ জুলাই সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় মেডিকেল কলেজগুলিতে। ১১ আগস্ট কাউন্সেলিং-এ ৭০টি আসন ফাঁকা রাখা হয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকেরা পুলিশের লাঠিচার্জের শিকার হন। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তুতিতে ১২ আগস্ট তৈরি হয় JEE (Medical) Guardians' Forum। ১৭ আগস্ট ক্যাপিটেশন ফি নিয়ে ছাত্রভর্তির পরীক্ষার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ছাত্রছাত্রীরা গ্রেপ্তার বরণ করে। এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে ফি-বৃদ্ধি ও ক্যাপিটেশন ফি বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২৪ আগস্ট ক্যাপিটেশন ফি ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করার কথা থাকলেও আন্দোলনের চাপেই সরকার তা এখনও ঘোষণা করতে পারেনি।

আন্দোলনের এই উত্তপ্ত বাতাবরণে কলকাতা হাইকোর্ট ২৮ আগস্ট রায় দেয় — জয়েন্ট এন্ট্রান্স-এ উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করে ক্যাপিটেশন ফি-র ছাত্রদের ভর্তি করা চলবে না। এই জয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানাবার সাথে সাথে এ আই ডি এস ও মেডিকেল ইউনিটের পক্ষ থেকে এক আবেদন পত্রে বলা হয়েছে, মেডিকেল শিক্ষার উপর আক্রমণ এই প্রথম নয়, এখানেই শেষও হবে না। এর আভাস পাওয়া যায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনির্ভাসিটি অফ হেলথ সায়েন্স-এর আইনের মধ্যেই, যেখানে মেডিকেল কলেজগুলিকে ধীরে ধীরে সেল্ফ-ফিনানসিং করার পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে নতুন মেডিকেল কলেজ খোলার নামে শিক্ষকদের কুমিরছানার মত দেখিয়ে বর্তমান কলেজগুলির পরিকাঠামো নিয়ে নিদারুণ ছিনিমিনি খেলা।

ঐ আবেদনে আরো বলা হয়েছে, "এস এফ আই নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করেছেন এবং ছাত্র অভিভাবকদের দ্বারা ধিক্কৃত হয়ে এখন সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। মেডিকেল শিক্ষার উপর ভবিষ্যতে তীব্রতর আক্রমণের বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে এস এফ আই-এর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মী ও সমর্থকদের আমরা ভেবে দেখতে বলব যে, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে তারা কি এস এফ আই নেতৃত্বের বংশবদ হয়ে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, নাকি বিবেকের নির্দেশে সঠিক আন্দোলনকেই শক্তিশালী করবেন।"

আন্দোলনের এই জয় থেকে শিক্ষা নিয়ে মেডিকেল শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি, পরিকাঠামোর যথাযথ উন্নতি সহ সাধারণ ছাত্রদের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সর্বোপরি বর্ধিত ফি সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের লক্ষ্যে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রী অভিভাবক, শিক্ষক ও সমস্ত জনসাধারণকে আবেদন জানানো হয়েছে।

১ আগস্ট কলকাতায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের হেড অফিসের সামনে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সদস্যদের বিক্ষোভে সংগঠনের সভাপতি কমরেড অমর রায় ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মন্ডল।

নদীভাঙ্গনের ভয়াবহ সমস্যা

একের পাতার পর

হবেনা। মানুষ বলে কোথায় খাদ্য? শিশুরাই বা খাবে কী? এমন ভরা বর্ষায় একটু করে ত্রিপলও কি জুটবে না? মন্ত্রীরা বলে, সবই আছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, ১৪৮৭ কোটি টাকা চাই। কেন্দ্রের 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ তহবিল' থেকে এই টাকা জরুরি। তাঁর হুঙ্কার — নইলে ত্রাণ-পুনর্বাসন হবে কি করে? বন্যা-ভাঙ্গনরোধের ব্যবস্থাই বা করব কি করে? গঙ্গা জাতীয় নদী। সমস্যা জাতীয় স্তরের। নিয়মমাফিক দুর্গতরা এসব কথা শোনে। এবারও শুনছে। আবার এ বছর এখানকার জেলা পরিষদ গেছে কংগ্রেস-তৃণমূল-বিজেপি'র মহাজোটের অধীনে। সি পি এমের হারানো মাটি পেতে, তাই দাবির বহর জোরদার করাই রণকৌশল। তাই আওয়াজ বেড়েছে, যেন ভাঙ্গনের তীব্রতা এবারই প্রথম এবার মুর্শিদাবাদ-মালদার ভাঙ্গন-রোধের জন্য ৪.২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তবে ত্রাণমন্ত্রীর একটা কথাই সত্য। তিনি নির্লজ্জ নির্মমতায় ঘোষণা করেছেন, মালদায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। কারণ, পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিলে মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের ভাঙ্গন দুর্গতিরাও পুনর্বাসনের দাবি তুলবে। স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয়তেও না বলে পারেনি যে, এটা নিকৃষ্ট রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা। এমন বিপর্যয়ে "জনদরদী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে দুর্গতের ক্ষতে নুনের ছিটে দেওয়া হয়েছে।"

আসলে ভাঙ্গনের এই সমস্যা রোধের নামে কিছু টাকা যা বরাদ্দ হবে — তাতে সমস্যার গায়ে আঁচড়ও কাটা যাবে না। তৃণমূল-কংগ্রেস-বিজেপি'র জেলা পরিষদ ও সি পি এম নেতৃত্বের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় চলবে পাবলিক ফাণ্ড

মুর্শিদাবাদ। বহরমপুর জেলা শাসকের অফিসের সামনে ১২ আগস্ট বন্যা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির অবস্থান

হল। স্থায়ী বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা সি পি এম সরকার গত ২৬টা বছরে নিতে পারেনি। সময়টা খুব কম বলেই বোধ হয়! সামগ্রিক পরিকল্পনার বদলে প্রতি বছর তৈরি হয়েছে রিটায়ার্ড বাঁধ। একের পর এক। আটটা। তলিয়ে গেছে। তৈরি করেছিল স্পার ভেঙ্গে গেছে — যেমন যায়। মুর্শিদাবাদেরই এক প্রতিরূপ তৈরি হচ্ছে মালদায়— ঔরঙ্গাবাদ, রানীনগর, জলঙ্গি, বেলডাঙ্গার মতো। পুনর্বাসনের জন্য ৫০০০ টাকা করে নাকি দেওয়া হবে পরিবার পিছু। অন্তত স্টেটসম্যান পত্রিকার ৩ সেপ্টেম্বরে এমনটাই খবর। এমন পুনর্বাসন ও ভাঙ্গনরোধের প্রতিশ্রুতি মুর্শিদাবাদ-মালদার মানুষ শুনেছে বিস্তর। সমীক্ষক দলের আনাগোনাও দেখেছে ভিড় করে বিস্তর। আদুল গায়ে ছেলেমেয়েরা চোখ বড় বড় করে দেখে হেলিকপ্টার। কাগজেই থাকে পুনর্বাসন। ভাঙ্গন-বন্যা রোধের দফায় দফায় পরিকল্পনাও থাকে কাগজে। রাজ্য কেন্দ্রকে দায়ী করে। কেন্দ্র অভিযোগ করে রাজ্যের দায়িত্বহীনতার। পুনর্বাসন হয়না। সরকারের নীতিতেই তা নেই। মুর্শিদাবাদে হয়নি। কোচবিহারে হয়নি। দিনাজপুরে হয়নি। হবেও না, যদি না বাধ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্র তছরূপের খেলা। দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদার, ক্ষমতাসীন রাজ্য-কেন্দ্রের দলগুলোর একাংশ ও প্রশাসনের একাংশের মিলিত চক্র ভাঙ্গন এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এই চক্র আরও শক্তিশালী হবে। অসহায়তার গভীরে ডুবে যাওয়া — ছন্নছাড়া যুবকদের একাংশ এই চক্রে ক্রমাগত জড়াবে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন। আমাদেরই মা অথবা বোন পেটের অন্নের জন্য দাঁড়াবে অন্ধকার রাস্তায়, এগিয়ে যাবে আরও এক ধাপ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এমন করুণ ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে চলেছে বছরের পর বছর। যদি দুর্গতদের ভাগ্যের চাকা একটুও ঘোরাতে হয় তবে চাই, রক্তক্ষয়ী আন্দোলন — দুর্বার প্রতিরোধ। প্রাণ বাজি রেখে সংঘাতে যেতে হবে। এই মুহূর্তে মালদার মাটিতে পঞ্চানন্দপুরের বিধবস্ত পটভূমিতে চাই আরও শত শত নহিরুদ্দিন। সেই সেখ নহিরুদ্দিন — বর্ষায় বোল্ডার ফেলা রুখতে, শুখা মরশুমে কাজের দাবিতে এবং ভাঙ্গনের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে খড়িবোনার ক্ষেতমজুর সেনানী কমরেড নহিরুদ্দিন — শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধে যে অনায়াসে প্রাণ দিয়েছিল পুলিশের গুলিতে ১৭ জুলাই, ২০০০। নহিরুদ্দিনের পথই হল জীবনের পথ।

কোকাকোলা-পেপসি

মানুষকে বিষ খাইয়ে মুনাফা লুটছে

পুঁজিবাদের সংকট যত বাড়ছে, ততই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ অত্যাচার লুণ্ঠন। দেশীয় পুঁজিবাদী শোষণের সাথে যুক্ত হয়েছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লুণ্ঠন ও শোষণ। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ আজ বেপরোয়া। একদিকে ঘটে চলেছে যুগোশ্লাভিয়া, আফগানিস্তান ও সর্বশেষ ইরাক আক্রমণের ঘটনা, অন্যদিকে যেসব দেশে সরাসরি অস্ত্রের আক্রমণ তারা করছে না, সেখানে ঘটছে অর্থনৈতিক আক্রমণ। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজার দখল করার নতুন নাম হয়েছে 'বিশ্বায়ন'। ভারতের মতো পুঁজিবাদী দেশগুলির পুঁজিপতিশ্রেণী আবার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে গাঁটছড়া বাঁধবার জন্য বিদেশী পুঁজির দ্বারা দেশের উন্নয়ন-এর তত্ত্ব আউড়ে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক সংস্থাগুলির জন্য দেশের বাজার খুলে দিচ্ছে। এর পরিণাম জনজীবনে কী ঘটছে, তারই একটি খন্ড ছবি দেখা গেল এবার কোকাকোলা-পেপসির ঘটনায়।

'গণদাবী'র পাতায় ইতিমধ্যে একাধিক আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছিল কত মারাত্মক ও ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বা বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগুলি দেশের নদী, নালা, হ্রদ ইত্যাদি, এককথায় দেশের জলসম্পদকে সুপেয় বোতলভর্তি জল সরবরাহ ও নরম পানীয় তৈরির নাম করে দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিচ্ছে। সেইসঙ্গে এও দেখানো হয়েছিল, এইসব মুনাফাসর্বস্ব কোম্পানিগুলি তাদের মুনাফার স্বার্থে যথেচ্ছভাবে জল তুলে নেওয়ার ফলে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর আরও দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে এবং তার ফলে ঐসব অঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, চাষের জমিতে জল দিতে পারা যাচ্ছে না, চাষীদের রুজি-রোজগার মার খাচ্ছে। সাম্প্রতিক তথ্য ও অভিযোগগুলি এর প্রতিটি দিককেই আরও নিশ্চিত করে প্রমাণ করছে, সেইসঙ্গে চাঞ্চল্যকর আরও কিছু বিষয়ও যুক্ত হয়েছে।

নয়াদিল্লীর 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যাণ্ড এনভায়রনমেন্ট' সংস্থা তাদের পরীক্ষায় কোকাকোলা ও পেপসি — এই দুই কোম্পানির বারোটি বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের নরম পানীয়ের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় কীটনাশক রাসায়নিক উপাদানের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছে। কেরালার রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও তাদের পরীক্ষায় দেখেছে যে, কোকাকোলা কোম্পানির পালাক্কড় কারখানার বটলিং প্ল্যান্ট (যেখানে বোতলে পানীয় ভরা হয়) থেকে নির্গত জলীয় পদার্থ আশপাশের ভূগর্ভস্থ জল ও চাষের ক্ষেতগুলোকে মাত্রাতিরিক্তভাবে বিষাক্ত করে তুলছে। দু'দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার এক রিপোর্টে জানায়, কোকাকোলার ডানকুনি, তারাতলা ও জলপাইগুড়ি এবং পেপসির নরেন্দ্রপুর — সব ক'টি কারখানা থেকে নির্গত গাদ ও অন্যান্য তরল পদার্থের মধ্যে বিষাক্ত ধাতব পদার্থ, এমনকি সীসা বা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ক্যাডমিয়ামের মত ধাতুও পাওয়া গিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, ছয় মাস আগে নয়াদিল্লীর উপরোক্ত সংস্থাটি (সি এস ই) জানিয়েছিল কোকাকোলা-পেপসি সহ বিভিন্ন কোম্পানির বোতলের পানীয় জলে অতি মাত্রায় কীটনাশক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে।

সারা পৃথিবী জুড়ে বহুল পরিচিত এই দুটি বৃহৎ নরম পানীয় কর্পোরেটের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে এমন সব মারাত্মক অভিযোগ পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্যপ্রযুক্তি গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট ও কলকাতার কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগার — এই দুই সংস্থা কোক ও পেপসির বারোটি নরম পানীয় 'ভারতীয় মান' অনুসারে দূষণমুক্ত বলে রিপোর্ট দেয়। এমনকি পেপসি, ডায়েট পেপসি এবং লিমকা — এই তিনটি পানীয়কে ইউরোপীয় মান অনুযায়ীও দূষণমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে, ইউরোপীয় মান অনুযায়ী যেটা দূষিত, ভারতীয় মান অনুযায়ী সেটা দূষিত নাও হতে পারে। কিন্তু তার মানে কি সেটা দূষণমুক্ত, পরিশুদ্ধ হয়ে গেল বা যেহেতু ভারতীয় মানটি সরকার নিচু স্তরে বেঁধে রেখেছে তাই ভারতীয় মান অনুযায়ী সেটা দূষিত নয়, অতএব তার কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই? কিন্তু ভারতীয় মান অনুযায়ী দূষিত নয়, স্রেফ এই অজুহাতে কোম্পানি দুটি সার্টিফিকেট পেয়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার উভয়েই দুই বৃহৎ কোম্পানিকে অভিযোগের হাত থেকে রেহাই দিয়ে দেয়। মহারাষ্ট্র হাইকোর্টও মহারাষ্ট্র ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোক, লিমকা, থামস আপ ও স্প্রাইট বিক্রি নিষিদ্ধ করে যে নির্দেশ দিয়েছিল — তাকে খারিজ করে দেয় (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭ আগস্ট, ২০০৩)।

অবশ্য সংসদে বিজেপি সরকার নিয়মরক্ষার্থে একটা যৌথ সংসদীয় কমিটি করে তার হাতে রিপোর্টগুলিকে আরও পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব দিয়েছে। কিন্তু এই সন্দেহ আদৌ অমূলক নয় যে, আমেরিকান কর্পোরেট পুঁজি ও তাদের রক্ষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চাপের মুখেই দুই নরমপানীয় সংস্থাকে (এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা) তাদের দুর্নাম ও শাস্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নতুন করে রিপোর্ট বানানো হয়েছে। সন্দেহ আরও জাগে যখন জানা যায়, এইসব কর্পোরেটদের হয়ে মার্কিন শাসকদের পক্ষে ওকালতি ও চাপ সৃষ্টির কথা। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট ব্ল্যাকউইল, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্রকে লিখেছিলেনঃ "আমাদের দু'দেশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ লগ্নীসংক্রান্ত একটি সমস্যা যা ঘটনাক্রমে গভীরতর হয়ে উঠতে পারে, তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমস্যাটিকে অতিক্রম করার জন্য আপনার সাহায্য চাইছি। সমস্যাটি কোকাকোলাকে কেন্দ্র করে, যারা ভারতে লগ্নীকারী বিদেশি কোম্পানিগুলির অন্যতম।"

অথচ কোকাকোলা ও পেপসি, এই দুই কুখ্যাত বহুজাতিকের কীর্তিকলাপের চরিত্র ও পরিধি কি? ভারতবর্ষের বহু জায়গায় যেমন কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে এদের কারখানা রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কারখানা-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগের চরিত্র হুবহু এক। কারখানা থেকে যে সমস্ত বর্জ্য তরল পদার্থ বার করে দেওয়া হয় তা আশপাশের জমি ও ভূগর্ভস্থ জলকে দূষিত করে দিচ্ছে, এমনকি তা জমির উর্বরতাও অনেকখানি কমিয়ে দিচ্ছে। কেরালার পালাক্কড়ের একটা উর্বর সবুজ অঞ্চলের মানুষ তিন বছর আগে যে জমি থেকে বছরে ৫০ বস্তা চাল ও ১৫০০ নারকেল পেত, কোকাকোলা কোম্পানির বর্জ্য পদার্থের কৃপায় (যা কোম্পানি আবার সার হিসাবে চাষীদের কাছে বিক্রি করে) সেই জমি থেকে পাঁচ বস্তা চাল আর শ'দুয়েক নারকেল পেয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। আর এক বিপজ্জনক বিষয় হল, দৈনিক লাখ লাখ লিটার জল টেনে নেওয়ার ফলে ভূগর্ভের জলের স্তর নেমে যাওয়া। রাজস্থানে জয়পুরের কাছে কালাডেরা গ্রামের আশেপাশে এই স্তর নেমেছে দেড়শ' ফুট। তামিলনাড়ুতে কাবেরীর শাখানদী ভবানীর অববাহিকায় জলস্তর এতটাই নেমে গিয়েছে যে, তার ফলে অঞ্চলে দেখা দিয়েছে তীব্র জলসঙ্কট এবং তাকে কেন্দ্র করে জল নিয়ে দাঙ্গা-খুনোখুনি। উত্তর প্রদেশের মত জনবহুল রাজ্যে,

বারাণসীর ২০ কিলোমিটার দূরে মেহদীগঞ্জে কোকাকোলা কারখানার দৌলতে জলস্তর নেমে গেছে ১৫ থেকে ৪০ ফুট — ফল জলসঙ্কট। মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় কুদুস বা কেরালার পালাক্কড় বা রাজস্থানের কালাডেরা — সর্বত্রই আজ জলের সঙ্কট এমন আকার নিয়েছে যে, গ্রামের মানুষকে দশ-পনের কিলোমিটার পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে রোজকার প্রয়োজনীয় জল আনতে হচ্ছে। স্বভাবতই এই জলসঙ্কটকে ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় যেমন দাঙ্গা বাধছে, তেমনি অন্যদিকে দানা বাধছে প্রতিবাদ। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষ ক্রমশই এইসব পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থা — যার মধ্যে কোক ও পেপসিই প্রধান, এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। বিনিময়ে তাদের জুটছে গ্রেফতারি, এমনকি স্থানীয় প্রশাসন বা রাজনীতির মাতব্বরদের কাছ থেকে আন্দোলন বন্ধ করার হুমকি। গত ৭ এপ্রিল কেরালার পেরুমাট্টি পঞ্চায়েত বিভিন্ন অভিযোগে কোকাকোলার কারখানার লাইসেন্স বাতিল করে। কিন্তু অচিরেই কোম্পানি সরকারি মহলের সহায়তায় লাইসেন্স বাতিলকে খারিজ করে দেয় এবং ৬ আগস্ট পর্যন্ত কারখানা চালাবার অনুমতি আদায় করে। ৬ আগস্টেই প্রকাশিত কেরালা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টে কারখানার বর্জ্যপদার্থে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও সরকার তা নিয়ে এখন টালবাহানা শুরু করেছে। মহারাষ্ট্র হাইকোর্টের রায়ের কথা আগেই বলা হল। এর মধ্যে আবার পেপসির মতো কিছু কোম্পানি নিজেরা প্রয়োজনীয় জল তোলে না। তারা অন্য কোনও কোম্পানির কাছ থেকে জল কেনে। ফলে সে জল পেপসির কারখানাতে লাগলেও তার জন্য কোন বিপত্তি ঘটলে তার দায় পেপসির ঘাড়ে পড়ে না।

এইসব কর্পোরেটদের প্রতি এদেশের সরকার কেমন সদাশয়, তার অনেক উদাহরণের একটি হল, শুরুতে যেসব শর্ত মেনে এরা কাজে নেমেছিল, চাপ দিয়ে এরা সেসব শর্তকে পরে শিথিল করিয়ে নিচ্ছে। ভারতে লগ্নী করার অনুমতি নেওয়ার সময় কোক কোম্পানিকে মানতে হয়েছিল পাঁচ বছরের মধ্যে তারা তাদের ইকুয়িটি শেয়ারের ৪৯ শতাংশ বিলগ্নীকরণ করবে। এখন তাদের চাপে সরকার যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে তাতে ভারতীয় লগ্নীকারীদের হাতে ৪৯ শতাংশ শেয়ার এলেও তাদের ভোটাধিকার থাকবেনা, অর্থাৎ কোম্পানির নীতিনির্ধারণে ভারতীয় লগ্নীকারীদের কোন ভূমিকা থাকতে পারবেনা, কোকাকোলার অপকর্ম নিয়ে তারা কোনও প্রশ্ন তুলতে পারবেনা।

যাঁরা বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের মধ্যে দেশের মানুষের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা কি জানেন সরকারি দাক্ষিণ্য পেয়ে এইসব মালটিন্যাশনালগুলি কি করে? ১৯৯৩-৯৪ সালে এক অনুসন্ধানে ফাঁস হয় যে, পেপসিকো একবার মাত্র ব্যবহার করা যাবে এমন প্লাস্টিকের বোতল এদেশে তৈরি করে আমেরিকায় রপ্তানি করত। আর এই বোতল তৈরি করতে গিয়ে যে সমস্ত বিষাক্ত বা দূষিত পদার্থ বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হত, সেগুলি তারা এদেশেই ফেলে দিত। আবার আমেরিকায় ব্যবহৃত ঐ বোতলগুলিই তারা এদেশে ফিরিয়ে এনে রিসাইক্লিং করে তাতে পানীয় ভরে এদেশে বিক্রি করত। অর্থাৎ যেতে এবং আসতে দুদিকেই বিষ জমত এদেশের মানুষের দেহে ও ঘরে।

কিন্তু শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বেই আজ এই কোম্পানিগুলি মানুষকে বিষ খাইয়ে মুনাফা লুটছে। লাতিন আমেরিকায় কোকাকোলার যারা এজেন্ট, যারা কোকাকোলার পানীয় বোতলভর্তি করে, তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার কোর্টেই মামলা রুজু করা হয়েছে। কলম্বিয়া ও গুয়াতেমালায় দক্ষিণপন্থী খুনে বাহিনী (ডেথ স্কোয়াড)-র সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের ভয় দেখানো, মায় খুন করার অভিযোগে। এই কোম্পানিকে পানামাতে তিন লক্ষ ডলার জরিমানা দিতে হয়েছে সেখানকার মাতাসনিল্লো নদীকে দূষিত করার অভিযোগে। আফ্রিকায় এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে কোম্পানির শ্রমিক-কর্মচারীর কাজের জায়গার স্বাস্থ্যবিধি না মানার জন্য। কেরালার পালাক্কড়-এর প্ল্যাচিমাডা গ্রামের অধিবাসীদের অভিযোগের খবর পেয়ে বিবিসি রেডিও-র সাংবাদিক জন ওয়েট সেখানকার জল ও বর্জ্য পদার্থ নিয়ে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে পরীক্ষা করান। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নমুনাতে বিষাক্ত সীসা ও ক্যাডমিয়ামের

চারের পাতায় দেখুন

অস্ত্র কিনতে এক খোঁচায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়ে গেল

একদিনের এক কলমের খোঁচায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অস্ত্র কেনার জন্য পনের হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। প্রতি বছর সামরিক খাতে ক্রমবর্ধমান সরকারি খরচের কথা মনে রাখলেও, এবারের খরচ নজির বিহীন। সদ্য বরাদ্দ করা বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করে যেমন ব্রিটেন থেকে হক্ ট্রেনার জেট বিমান কেনা হবে, তেমনি ৭২৭ কোটি টাকা খরচ করে সাতটি বিশেষ জেট বিমান কেনা হবে ভি আই পিদের জন্য। ভুখা মানুষের রক্ত মোক্ষণ করা টাকায় ভি আই পিদের জন্য এই বিমান কিনতে চক্ষুলজ্জায়ও বাধছে না 'মূল্যবোধের রাজনীতি'-র স্বঘোষিত দাবিদার বিজেপি নেতাদের। সুরাজের প্রতিশ্রুতি তাঁরা এমন সুচারুভাবে রক্ষা করছেন যে স্থলে জলে শুধু নয়, আকাশেও নাকি তাঁদের নিরাপত্তা নেই। অতএব শুধু বিলাসবহুল বিমান হলেই চলবে না, তাঁদের জন্য এখন সশস্ত্র বিমান চাই। যে সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্যে কিছু ভরতুকি দিতে হলেই অর্থাভাবের দোহাই দেয়, সেই সরকারই যখন অস্ত্র কিনতে অকাতরে জলের মতো হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে, তখন একথা বুঝতেও কোন অসুবিধা হয় না যে, ভরতুকির প্রশ্নে অর্থাভাবের দোহাই নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। টাকা সরকারের যা আছে, জনস্বার্থে তারা তা খরচ করবে না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে ভারত সহ বিশ্বজুড়ে দেশে দেশে বুর্জোয়া সরকারগুলি বছরের পর বছর বিশাল টাকা খরচ করছে। এজন্য কত টাকা খরচ করা হচ্ছে সরকার তার হিসাব সাধারণত দেয় না। একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রের মোর্চা সরকার কর ছাড় দিয়েছিল ২২ হাজার কোটি টাকা (সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস, ৯.৭.০২)। উদারীকরণ, বিশ্বায়নের ধুয়ো তুলে তারা মালিকশ্রেণীকে ঢালাও কর ছাড় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। ফলে দুনিয়া জুড়ে তারা আওয়াজ তুলছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনস্বার্থে প্রদত্ত ভরতুকি কমাও। ধনী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তুলনায় পশ্চাদপদ দেশগুলিকে ঋণ দেওয়ার সময় শর্ত দিচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবহণে ভরতুকি কমিয়ে টাকা শোধের ব্যবস্থা করতে হবে। অথচ, সবাই ক্রমাগত মারণাস্ত্র তৈরি করছে, যুদ্ধ সজ্জা করছে, এখানে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কোকাকোলা-পেপসি

তিনের পাতার পর

মাত্রাতিরিক্ত অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বোপরি খোদ আমেরিকায় কোকাকোলার পানীয়গুলিকে বাজারজাত করার প্রক্রিয়ায় কারচুপি করে এদের চাহিদাকে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।

অর্থাৎ হাটে-মাঠে-ঘাটে যে কোম্পানিদ্বয়ের বিজ্ঞাপনে অহরহ বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে, তাদের পানীয় জীবনে স্ফূর্তি এনে দেবে, ক্লান্তি দূর করবে। বকলমে অন্য ব্র্যাণ্ডের নাম দিয়ে যারা সুদৃশ্য বোতলে "পরিষ্কার জল" বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে — দেশে-বিদেশে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা কারচুপি করে, শর্ত ভাঙ্গে, প্রতিবাদী আন্দোলনকে ভাঙার জন্য ভাড়াটে খুনে নিয়োগ করে। তারা মুনাফার জন্য অবাধে জল তুলে নিয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করে। এমন কি পানীয়ের মধ্যে কীটনাশক, বিষাক্ত ধাতু ও রাসায়নিক উপাদান আছে জানা সত্ত্বেও তা মানুষকে তারা খাওয়াচ্ছে। এই হল বাস্তব। এই বাস্তবটা আজ মানুষের চোখের সামনে কমবেশি ফুটে উঠেছে। কিন্তু শুধু সেটুকু দেখে, জেনে, বুঝে তো এই জুয়াচোর খুনী অপরাধীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাই এই বাস্তবের পেছনকার আর এক বাস্তবতাকেও বুঝতে হবে।

বলে বোঝানোর দরকার পড়ে না, তবু সমস্যার গুরুত্ব বুঝে আবার বলা যেতে পারে। নির্মল পানীয় জল মানুষের জীবনে অপরিহার্য। অথচ স্বাধীনতার পর অর্ধশতক পার হয়ে গেলেও আজও এদেশের কোনও সরকার দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য নির্মল পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে পারল না। বরং শুধু প্রত্যন্ত গ্রামদেশেই নয়, মেট্রোপলিস শহরগুলিতেও পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবা অবহেলা-দুর্নীতি-ঔদাসীন্যে ভেঙে পড়ছে। অথচ সুপেয় জলের চাহিদা ও আকুতি তো যাবার নয়। সেটা বুঝেই আজ কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলো জলসম্পদকে তুলে দিচ্ছে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজিপতিদের হাতে। আর তারা মানুষের জীবনের এই একান্ত অপরিহার্য উপাদানটি নিয়ে শুধু অবাধে মুনাফা লুটছে তাই নয়, আরও মুনাফার জন্য কীটনাশক সমেত তা বিক্রি করছে। বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করছে সম্পূর্ণ বাধাহীন, নির্লিপ্তভাবে। আর এদেশের সরকার, প্রশাসন তথা বিচারবিভাগ এই ঘৃণ্য অপরাধীদের হাত থেকে দেশের মানুষকে বাঁচাবার বদলে, এদের মুনাফায় যাতে টান না পড়ে, এদের বদনাম যাতে না বাড়ে তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে এদের অপরাধমুক্ত করে দিচ্ছে, বেকসুর খালাস করে দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় খুনী অপরাধী কর্পোরেট পুঁজিপতিরা পাচ্ছে মুনাফা শিকারের অবারিত সুযোগ, আর সরকারি দলগুলো পাচ্ছে এদের দাক্ষিণ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকার, তথা ক্ষমতা দখলের বাড়তি সুযোগ। এই প্রক্রিয়ার অংশীদার যেমন বিজেপি, কংগ্রেস, এ আই ডি এম কের মত দলগুলি, তেমনই সি পি এমও এর ভাগীদার। কারণ, মুখে মালটিন্যাশনালদের বিরুদ্ধে বললেও তারা কোক-পেপসি সম্পর্কিত রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে, কিন্তু জনসমক্ষে তা প্রকাশ করেনি। ইতিপূর্বে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সময় এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে কোলাকোলা-পেপসি বর্জনের ডাক দেওয়ার জন্য সিপিএম নেতৃত্বকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তখন তারা সাড়া দেয়নি।

এটাই আজ বাস্তব এবং পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে, এ বাস্তবের হাত থেকে সাধারণ মানুষ কিছুতেই রেহাই পাবে না। এ শুধু কোকাকোলা, পেপসি বা এনরন বা এই ধরনের একটা-দুটো দুর্বিনীত, দুর্নীতিপরায়ণ কোম্পানির ব্যাপার নয়। এ হল আজকে মুমূর্ষু পুঁজিবাদের যেভাবে হোক বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত রকম নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে মুনাফা শিকার অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টার একটা রূপ মাত্র। এ বাস্তবের বিরোধিতা করতে গেলে, প্রতিবাদ করতে গেলে হুমকির মুখে পড়তে হবে, গ্রেফতার হতে হবে, মার খেতে হবে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ সংগঠিতভাবে একে প্রতিরোধ না করতে পারলে — খুনি অপরাধী কর্পোরেটদের সাহস, চক্রান্ত ও নিষ্ঠুরতা নিরন্তর বাড়বে। সরকার-প্রশাসন-বিচারবিভাগও আরও নির্লজ্জভাবে এদের রক্ষা করবে। তার জন্য নানারকম বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব ও তথ্যও ছড়াবে, মানুষকে ভুল বোঝানোর জন্য। যেমন কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলি আজ দেখছে যে তাদের নির্লজ্জ দালালি ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বহু মানুষ কোকাকোলা-পেপসি বর্জন করেছেন। প্রচারমাধ্যমে সরকারি দপ্তরের তরফে 'নির্দোষ' প্রশংসাপত্র দেওয়া হলেও মানুষ আগের মতো নিচ্ছে না। প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপনেও মানুষ ভুলছে না। অথচ কর্পোরেটদের উদ্ধার না করে ত উপায় নেই। তাই নতুন করে আজ প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে বলা হচ্ছে যে, এদেশে তো সবেতেই ভেজাল, সবেতেই কীটনাশক, মায় খাদ্যে পর্যন্ত। কেবলমাত্র কোক-পেপসিকে দোষ দিয়ে লাভ কি? যা বলা হচ্ছে না, তা হল সবেতেই যদি ভেজাল বা বিষ থাকে তবে সময়, সাধ্য, সুযোগমত সবেরই প্রতিবাদ করে প্রতিকার করা উচিত। কিন্তু এই যুক্তিতে যে অপরাধীর অপরাধ প্রকাশ্যে এসে গেছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার বা তাকে নরম করে দেখানোর প্রশ্ন উঠবে কেন? সমাজে ত' তাহলে কোন চোর বা দুর্নীতিবাজেরই শাস্তির প্রয়োজন নেই, কারণ তাহলেই কথা উঠবে, যেখানে সমাজভর্তি চোর বা দুর্নীতিবাজ, সেখানে একা একজনকে শাস্তি দিয়ে লাভ কি? এ যুক্তি ত' চোর বা দুর্নীতিবাজদের। আর ওদের ডলারের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে যারা, সেই বিবেকহীন তাঁবেদারদের মতলবকেও বোঝা আজ সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জরুরি।

বস্তুত, কোকাকোলা-পেপসি কান্ড এমনই এক উদাহরণ যা আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের চেহারা আজ কত ভয়ঙ্কর, কত নির্মম, কত বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সেজন্যই এধরনের যেকোন অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা আজ জরুরি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

(তথ্যসূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস্ পত্রিকার প্রাক্তন নিউজ এডিটর অর্জুন সেনের নিবন্ধ, ১২ আগস্ট '০৩ দি স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত)

পুলিশের গুলিতে হত্যার প্রতিবাদে দুর্গাপুর বন্‌ধ

একের পাতার পর

সুরেই লিখেছে — "তাণ্ডবকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস এবং তারপর গুলি চালায়। গুলিতে তিনজনের মৃত্যু হয়।" পুলিশের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে দাসু পোড়েল, কানাই রুই দাস ও নওশাদ আহমেদের। গণশক্তি এদের পরিচয় দিতে লিখেছে দাসু পোড়েল মাছ ব্যবসায়ী, নৌসাদ আহমেদ দুর্গাপুরে এসেছিলেন রুটিরুজির সন্ধানে (দ্রঃ গণশক্তি ৫-৯-০৩)। এরা সমাজবিরোধী এই কথা গণশক্তিও বলতে পারেনি। এখানেও সেই কংগ্রেস আমলের প্রতিচ্ছবি, পুলিশ 'দুর্বৃত্তদের' ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালাল, প্রাণ গেল নিরীহ মানুষের। এছাড়াও নিরীহ পথচারী, স্কুল ছাত্র, দোকান কর্মচারীদের পুলিশ ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করে। পার্টির রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এই ঘটনায় বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকার ও পুলিশের গাফিলতি ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে ৫ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন — এই ঘটনায় আহত ১৩ জন বিধাননগর হাসপাতালে ভর্তি আছে, যাদের কোন চিকিৎসা হচ্ছে না। তিনি বলেন, গতকাল রাতে ভিরিঙ্গী মোড় ও নইমপাড়ায় গরিবদের বস্তিতে পুলিশ বাড়ি বাড়ি ঢুকে ব্যাপক অত্যাচার চালায় ও ভাঙচুর করে এবং ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। এমনকি পথ দুর্ঘটনায় মৃত বচ্চন সিংয়ের স্ত্রী এসে যখন পুলিশের পায়ে ধরে প্রতিকার চাইছে, তখন সরকারি তক্‌মা আঁটা গুণ্ডা বামফ্রন্টের পুলিশ সেই সদ্যবিধবাকে বেধড়ক পেটায়।

নিহতদের স্মরণে ৭ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুরে এস ইউ সি আই-র শোকমিছিল

এরপরই যে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদে পথে নেমেছেন, তাতে বোঝা যায় এ-বাংলার বিবেক আজও মরেনি। গণআন্দোলনের প্রতি শাসক বামপন্থীদের বেইমানির প্রতিক্রিয়ায় যে নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছিল, মানুষ তা কাটিয়ে বেরিয়ে আসছেন। রাজ্য সম্পাদক আরও বলেছেন — সমগ্র ঘটনা নিয়ে আমাদের দল আন্দোলন চালিয়ে যাবে, নাগরিক কনভেনশন ও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করবে, মানবাধিকার কমিশনের কাছে আবেদন জানাবে। ঘটনাস্থলে শহীদবেদী স্থাপন করবে।

দুর্গাপুরের বিক্ষুব্ধ মানুষের মুখর প্রতিবাদকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা বলব — অতীতে রাজনীতি বিচার না করে গণআন্দোলনে জনগণ প্রশংসনীয় লড়াই ও আত্মত্যাগ করলেও মেকি বামপন্থীরা তাকে কাজে লাগিয়ে মসনদে বসে আজ গণআন্দোলনকে পেটাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মানুষকেই রুখে দাঁড়াতে হবে এবং রাজনীতি বিচার করে সঠিক গণআন্দোলনের শক্তিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। একমাত্র এভাবেই জনগণের আন্দোলনকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

মনগড়া ধারণা নিয়ে চলার অভ্যাস প্রসঙ্গে

(অন্ সাবজেকটিভিজম্)

মাও সে-তুঙ

(বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা, চীন বিপ্লবের রূপকার কমরেড মাও সে-তুঙের ২৭তম স্মরণ দিবস ৯ সেপ্টেম্বর। এই উপলক্ষ্যে, প্রকৃত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে মহান নেতার অনন্য একটি রচনা থেকে একটি অ)শ আমরা এখানে প্রকাশ করলাম। বা)লা অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব আমাদের। —সম্পাদক, গণদাবী)

দলের কিছু সদস্যের মধ্যে মনগড়া ধারণা নিয়ে চলার অভ্যাস মারাত্মকভাবে রয়েছে। এই অভ্যাস যেকোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সঠিকভাবে বোঝা ও সেই অনুযায়ী দলের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুতর বাধা। মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে কোনও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এবং সেই অনুযায়ী দলের কাজ পরিচালনা করলে, তা অবশ্যম্ভাবীরূপে হয় সুবিধাবাদ, না হয় হঠকারিতার জন্ম দেবে। দলের অভ্যন্তরে একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত ভাবনাধারণার ভিত্তিতে সমালোচনা, ভিত্তিহীন যথেচ্ছ কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া, অথবা পারস্পরিক সন্দেহপ্রবণতা ইত্যাদি প্রায়শই দলের মধ্যে নীতিহীন বিতর্কে প্ররোচনা দেয় এবং দলের সংগঠনকে দুর্বল করে।

দলের আভ্যন্তরীণ সমালোচনা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। তা হচ্ছে, কিছু কমরেড তাদের সমালোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির পরিবর্তে সাধারণ ছোটখাটো বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁরা বোঝেন না যে, সমালোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ত্রুটিগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা। ব্যক্তিগত ত্রুটির প্রশ্নে বলা যায়, সেগুলি যদি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুলভ্রান্তির সাথে সম্পর্কিত না হয়, তাহলে তা নিয়ে এমন খড়্গহস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই যা সংশ্লিষ্ট কমরেডদের ফাঁপড়ে ফেলে দেয়। তাছাড়া, দলের মধ্যে এই ধরনের সমালোচনা একবার চালু হয়ে গেলে বড় ধরনের বিপদের সম্ভাবনা থাকে — দলের সমগ্র নজর তখন কেবলমাত্র ছোটখাটো সাধারণ ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির উপরই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে প্রত্যেকেই ভীতসন্ত্রস্ত এবং পোষাকি শিষ্টাচার ও ভদ্র আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দলের রাজনৈতিক কর্তব্যকর্মকে পালন করতে ভুলে যায়।

শুদ্ধিকরণের পদ্ধতি হচ্ছে ঃ প্রধানতঃ দলের সদস্যদের এমনভাবে শিক্ষিত করা, যাতে তারা তাদের চিন্তাকে ও দলের আভ্যন্তরীণ জীবনকে রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত করার স্তরে উন্নীত করতে পারে। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য আমাদের অবশ্যই (১) পার্টি সদস্যদের শেখাতে হবে — নিজস্ব মনগড়া বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পরিবর্তে কিভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীগুলির ভূমিকা নিরূপণ করতে হয়। (২) পার্টি সদস্যদের দৃষ্টি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার দিকে পরিচালিত করতে হবে, যাতে তার দ্বারা সংগ্রামের কৌশল ও কর্মপদ্ধতি তারা নিরূপণ করতে পারে। এবং কমরেডদের বোঝাতে হবে যে, বাস্তব অবস্থাকে যথাযথ অনুধাবন করতে না পারলে, তারা আজগুবি চিন্তা ও হঠকারিতার অতলে নিমজ্জিত হবে। (৩) দলের আভ্যন্তরীণ সমালোচনার ক্ষেত্রে মনোগত ধারণা, অন্ধতা ও রুচিহীন আচরণের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে, প্রকৃত ঘটনার উপর ভিত্তি করে বক্তব্য রাখতে হবে এবং রাজনীতিকে মূল প্রতিপাদ্য করে সমালোচনা করতে হবে।

("অন রেকটিফিকেশন অফ ইন্‌কারেকট আইডিয়াজ ইন দি পার্টি" নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পিপল্‌স, পাবলিশিং প্রেস, ১৯৫৪)

দশটি স্কুলের অনুমোদন বাতিল

বেসরকারীকরণের চতুর পদক্ষেপ

রাজ্যে দশটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল হতে চলেছে। কারণ, গত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে শোচনীয় ব্যর্থতা — একজন পরীক্ষার্থীও পাশ করতে পারেনি। টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের সভাপতি দিব্যেন্দু হোতা বলেছেন ঃ "যে সমস্ত স্কুলের একজন ছাত্রও মাধ্যমিকে পাশ করতে পারে না — সেই সমস্ত স্কুল চালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না।" উল্লেখ্য, এগুলো সবই সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল। একটা সমীক্ষক দল তিন বছরের ফলাফল বিচার করে এই স্কুলগুলোর অনুমোদন বাতিল করার সুপারিশ করেছে। কর্তৃপক্ষ সেই অনুযায়ী যা করার করেছেন। বোর্ড শিক্ষাদপ্তরকে অনুমোদন বাতিল করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। বোর্ড সভাপতি বলেছেন, এই ধরনের পদক্ষেপ এ রাজ্যে এই প্রথম। সংবাদে প্রকাশ, একটা বিষয়েও ঐ পরীক্ষার্থীরা পাশ করতে পারেনি। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের অন্য স্কুলে, যেখানে শিক্ষকের অভাব আছে সেখানে, পাঠানো হবে। (সূত্র ঃ দি টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ২ আগস্ট ০৩)

লেখাপড়া না-হওয়ার জন্য এই ধরনের কড়া শাস্তিমূলক পদক্ষেপ অনেক অভিভাবকের মধ্যেও যেন স্বস্তির মনোভাব সৃষ্টি করেছে। "কারণ মাস্টাররা মাসে মাসে মাইনে নেয়, পড়ায় না। সব তো ফাঁকিবাজ।" এ প্রচারও কম জবরদস্ত নয়। এ সব নিয়ে মাস্টারমশাইদের 'চাবকানো'র প্রস্তাবও শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যে দিয়েছেন। তাদের ৮ ঘণ্টা ডিউটি করার কথাও বলেছেন। প্রাইভেট টিউশন করা হবে না — এ মর্মে মুচলেকা আদায় করার চেষ্টাও তো কম হয়নি। কাজেই পঠন-পাঠনের ব্যাপারে সরকারি কড়া দাওয়াই বেশ যুৎসই বলে অনেকে মনে করছেন। খোদ কলকাতার দুটি স্কুল, উত্তর চব্বিশ পরগণার চারটে, বর্ধমান, হাওড়া, পুরুলিয়া, মালদহের একটা করে স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষায় ফেল হওয়ার কারণে মানসিক হতাশার সঙ্গে বাড়তি কলঙ্ক জুটল — তাদের জন্য স্কুল অনুমোদন বাতিল হচ্ছে। তাদের মনের কথা ও জিজ্ঞাসার কোন তথ্য সংবাদপত্রে ছিল না।

এই কড়া দাওয়াই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে হচ্ছে — (এক) শাস্তি দেওয়া হল কাকে? শিক্ষকরা অন্যত্র বদলি হবেন। আর যাই হোক্ তারা শাস্তির বাইরে। (দুই) অনুমোদন বাতিলের পর এলাকার ঐসব স্কুলের ছাত্ররা যাবে কোথায়? (তিন) ঐ স্কুলের ঘর-বাড়ি সরঞ্জাম-এর মালিক হবে কে? জনগণের অর্থব্যয়ে ঐ সম্পত্তির পরিণাম কি হবে? (চার) পর পর তিন বছরের ফল পরীক্ষা করে শোচনীয় ব্যর্থতা যখন দেখা যাচ্ছিল, বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষাদপ্তর কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? অনুমোদন যখন স্কুলগুলো পেয়েছিলো তখন এটা ধরে নেওয়া যায় উপযুক্ত ন্যূনতম মান সেখানে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার ফলাফলে নিশ্চয়ই ছিল। সুতরাং চোখের সামনে এমন অধঃপতন ঘটতে পারল কেন? বিশেষ করে তো যখন সরকারে স্কুল তদারকি করার একটা বিভাগ ও ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা আছেন। (পাঁচ) লেখাপড়া করানোর জন্য ক'জন শিক্ষক কতজন ছাত্রের দায়িত্বে ছিলেন — এটাও জরুরি প্রশ্ন।

কর্তব্যে অবহেলা করার জন্য স্কুলের অনুমোদন বাতিল করাটা যদি ন্যায্য হয়, পাশাপাশি এইসব প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাবিভাগে, সরকারি পঠন-পাঠনে অবহেলার শাস্তিই বা হবেনা কেন?

সাম্প্রতিক সরকারি পদক্ষেপের যুক্তি মানতে হলে মানতে হয় মাথাযন্ত্রণা হলে মাথা কেটে ফেলাটাই ভাল। স্তরে স্তরে অবহেলার দায় অসহায় ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সরকার এক হীন সঙ্কীর্ণ মতলবকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে — এ কথা মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

এইসব স্কুলগুলোর অনেকগুলোকেই জুনিয়ার হাই থেকে হাইস্কুল করা হয়েছিল। ব্যাস, ওখানে শেষ। শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো ও অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নে কোনো দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা তপন রায়চৌধুরী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পঠন-পাঠন-পরীক্ষা ফলাফল ইত্যাদি ভাল করার নামে কড়া দাওয়াই-এর আড়ালে বেসরকারীকরণের মতলবের সপক্ষে পপুলার মাইণ্ডকে সরকার কাজে লাগাচ্ছে।

কিছুদিন আগে সরকারি সার্কুলারে জানানো হয়েছে, শহরের স্কুলে ৬০ শতাংশ এবং গ্রামের স্কুলে ৪০ শতাংশ পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই পাশ করতে হবে। "আশানুরূপ" এই ফল না দেখতে পেলে তিনবছর দেখে তারপর স্কুল অনুমোদন বাতিল করা হবে। এই রাজ্যে এই সিদ্ধান্তের প্রথম বলি আলোচ্য দশটি স্কুল। এই সার্কুলার শুনে মনে হয়, সরকার পঠন-পাঠনের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। পঠন-পাঠনে ঢিলেঢালা অবস্থা, শিক্ষকদের ফাঁকিবাজি রুখতেই বুঝি এ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এটা বোকা বানানোর কৌশল ছাড়া কিছু নয়। যদি সরকার সত্যিই পঠনপাঠনের মান রক্ষায় যত্নশীল ও দায়িত্ববান হত, তাহলে কোন যুক্তিতে তারা শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত এক ধাক্কায় ১ ঃ ৪০ (অর্থাৎ ৭৯ জন ছাত্র পিছু ১ জন শিক্ষক, ৮০ জন ছাত্র হলে দ্বিতীয় শিক্ষক) থেকে বদলিয়ে ১ ঃ ১৫৯ করে দিল? ১৫৯ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক! কি ভয়াবহ ব্যাপার ভাবা যায়?

শুধু তাই নয়, মাধ্যমিক স্কুল স্তরে ৪০ হাজার, প্রাথমিকেও ৩৫ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য। নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে। তার ফলাফল কী? একদিকে শূন্যপদে শিক্ষকের অভাব, অপরদিকে যারা কর্মরত তাদের ওপর মাথাপিছু ১৫৯ জন ছাত্রের বোঝা চাপিয়ে যেটুকু শিক্ষার মান ছিল তাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। আবার যারা মাধ্যমিক স্কুলে পঞ্চম মশ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে সেইসব ছাত্রছাত্রী অটোমেটিক প্রমোশন প্রথার দ্বারা উত্তীর্ণ। এমন কাঁচা ভিতের ওপর সরকার ইমারত গড়তে চাইছেন, অল্প কিছু শিক্ষক দিয়ে! ক্লাসরুমও কম! একদিনে সবাই স্কুলে এলে বসতে পারে না বলে বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসার দিন ঠিক করে দেওয়া হয়েছে অনেক এলাকাতেই। একটা ধ্বসে পড়া নিকৃষ্ট শিক্ষা পরিকাঠামোর ওপর শুয়ে থাকা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে উৎকৃষ্ট ফলের অন্যায় দাবিদার সরকার। অপরাধী করছে শিক্ষকদের। শাস্তি দিচ্ছে শিক্ষকদের। জনসাধারণকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। এর মধ্যেই বলি হয়ে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। অনুমোদন বাতিল করার কড়া দাওয়াই-এর নেপথ্যে আসলে এভাবে শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত করা ও শিক্ষার ব্যয়ভার, দায়দায়িত্ব সরকার ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে। প্রাথমিকেও সরকার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করছে। বেসিক ট্রেনিং না থাকলে নিয়োগ হবে না। হঠাৎ যেন এর প্রয়োজন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। লক্ষ লক্ষ মাধ্যমিক পাশ বেকার ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে — অথচ সরকারি নিরিখে প্রাথমিক শিক্ষকপদে চাকরির যোগ্যতা নেই! একজন করে শিক্ষক দিয়ে চলছে হাজার হাজার স্কুল। চারটি ক্লাস। পড়াবে কে? ড্রপআউটের রেকর্ড সংখ্যাটি বাদ দিয়ে যারা থাকে তারাই যাচ্ছে মাধ্যমিক স্কুলের পঞ্চম মশ্রেণীর পড়ুয়া হয়ে।

এই প্রতারণার কৌশল আবিষ্কার কি রাজ্য সরকারের নিজস্ব গবেষণায় ? মোটেই না। অনেক বছর আগেই "জাতীয় শিক্ষানীতি'৮৬"-এ প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয় অনর্থক বলে ঘোষণা করেছিলেন। বর্তমানের কেন্দ্রীয় সরকার সেই নীতিকেই আর একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে রূপ দিচ্ছে। দিচ্ছে বিভিন্ন রাজ্য সরকারও।

মাত্র কিছুদিন আগে, ওড়িশা সরকার ৫০০ কলেজ আর ১৫০০ স্কুলকে বন্ধ করে দেওয়ার

সাতের পাতায় দেখুন

গণহত্যাকারী আরিয়েল শ্যারন

একের পাতার পর

ভিতরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আঁচ করে বিজেপি সরকার শ্যারন আসার কয়েকদিন আগেই হঠাৎ প্যালেস্টাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ভারত সফর করিয়ে নিয়ে দেখাতে চাইল, ভারত সরকার ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন দু'পক্ষেই রয়েছে। স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিচ্ছে, আর যে ঘাতকরা প্রাণ নিচ্ছে — সেই দুই পক্ষকে এক পংক্তিতে বসিয়ে যারা 'নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির' নামে ঢাক বাজায়, তাদের চেয়ে বড় ভণ্ড, মানবতার বড় শত্রু আর নেই।

ইজরায়েলের ঘাতকতন্ত্রকে এখন ভারত 'গণতন্ত্র' বলে সম্বোধন করছে। এই নামকরণের মধ্যে ভারতের বিদেশনীতির বর্তমান চেহারাটা স্পষ্ট হয়। গত ৮ মে আমেরিকায় 'জিওনিস্ট' আমেরিকান ইহুদীদের এক কমিটির সভায়, ভারত সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র — "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিপদের" বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ভারত-আমেরিকা-ইজরায়েল জোট গঠনের ডাক দেন। এই লড়াইয়ের অর্থ কী, তা আফগানিস্তান ও ইরাকে জর্জ বুশ, প্যালেস্টাইনে আরিয়েল শ্যারন, আর ভারতের গুজরাটে বাজপেয়ি-আদবানি-নরেন্দ্র মোদী এ্যাণ্ড কোম্পানি দেখিয়েছে। বুশের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দুনিয়া দেখেছে, ভারতবাসীরা দেখেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। কিন্তু আরিয়েল শ্যারন?

'জিয়োনিস্ট' অর্থাৎ উগ্র ইহুদীবাদীরা ইহুদী জনসাধারণকে মিথ্যা বুঝিয়েছিল যে, প্যালেস্টিনীয় আরবরা গায়ের জোরে তাদের মাতৃভূমি দখল করে বসে আছে, যে কোন ভাবে তাদের তাড়িয়ে স্বদেশ মুক্ত করতে হবে। এ ডাকে সাড়া দিয়ে চল্লিশের দশকে তৎকালীন ব্রিটিশ উপনিবেশ প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদীদের মদতে গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি ইহুদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। এরকমই একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হচ্ছে শিন্‌বেত। শিন্‌বেত-এরই যুব শাখা হচ্ছে হাগানা। আরিয়েল শ্যারন ১৪ বছর বয়সে হাগানা-র সদস্য হন। আরব দেশগুলির উপর ইহুদিবাদী ইজরাইলের প্রথম সামরিক হানার কয়েক মাস আগে ১৯৪৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের দার ইয়াসিন গ্রামের গণহত্যা দিয়ে আরিয়েল শ্যারনের হাতেখড়ি হয়। প্রায় ২০ হাজার প্যালেস্টিনীয় অধ্যুষিত দার ইয়াসিন গ্রামকে 'মুক্ত' করার জন্য সে গ্রামে অতি সুকৌশলে দাঙ্গা বাধায় শিন্‌বেতের যুব শাখা হাগানা। এ দাঙ্গার বলি শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা মিলিয়ে ১৫ হাজার মানুষ। ঘরবাড়ি হারিয়ে অবশিষ্ট নিরাশ্রয় প্যালেস্টিনীয় মানুষ আশ্রয় নেয় শাটিলা উদ্বাস্তু শিবিরে। পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সালে গাজা অঞ্চলে ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার আরিয়েল শ্যারনের নির্দেশে ট্যাঙ্কের তলায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় শাটিলা উদ্বাস্তু শিবির।

১৯৬৭ সালের আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের অব্যবহিত পরে গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে আরিয়েল শ্যারন প্যালেস্টিনীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনকে চূর্ণ করে দেবার জন্য সপ্তাহকাল ধরে এক বিভীষিকার রাজ্য তৈরি করেছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আনা ১,৮০,০০০ ইহুদী নাগরিককে বসিয়ে দেবার জন্যই ইজরায়েলি সেনাবাহিনী আরিয়েল শ্যারনের নির্দেশে ঐ অঞ্চলে প্যালেস্টিনীয়দের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল।

১৯৭২ সালের গাজা ভূখণ্ডের ১,২০,০০০ প্যালেস্টিনীয় উদ্বাস্তু অধ্যুষিত জেবালায়া উদ্বাস্তু শিবিরটিকে ভেঙ্গে দিয়ে গাজা ভূখণ্ড থেকে জেবেজ পর্যন্ত ৩০ মাইল দীর্ঘ রাস্তাটিকে চওড়া করার জন্য ইজরায়েলি সেনাবাহিনী বুলডোজার ও ট্যাঙ্কের সাহায্যে প্যালেস্টিনীয় উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থলগুলি চুরমার করে দেয়। ইজরায়েলি সেনারা গাজা ভূখণ্ডে তাদের তৎকালীন সেনা কমাণ্ডার আরিয়েল শ্যারনের নামে রাস্তাটির নামকরণ করে "শ্যারন বুলেভার্ড"।

১৯৮২ সালে পশ্চিম বেইরুটের সারা উদ্বাস্তু শিবিরের উপর দিয়ে ইজরায়েলি ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেওয়া আরিয়েল শ্যারনের আর একটি মহান(!) কীর্তি। এ ঘটনায় সারা উদ্বাস্তু শিবিরে ৫ হাজার মানুষ নিহত হয়।

২০০২ সালে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক অঞ্চলে অবস্থিত জেনিন উদ্বাস্তু শিবিরেও একইভাবে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয় প্রায় ৫ হাজার প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তুদের। গণহত্যার এমন মর্মান্তিক কাহিনী শেষ হওয়ার নয়। ইজরায়েলি ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকারী হেলিকপ্টার ও আধুনিকতম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইন জনগণের অস্ত্র হচ্ছে ইট-পাথরের টুকরো, গাদা বন্দুক, বড়জোর হাত বোমা। এই নিদারুণ অসম লড়াইয়ে চোখের সামনে স্বজনদের মর্মান্তিক মৃত্যুর মিছিলে দেখতে দেখতে নিরুপায় প্যালেস্টিনীয় যুবকরা ব্যক্তিসন্ত্রাসের রাস্তায় পা ফেলে। ইজরায়েলি নৃশংস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসই প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম দিয়েছে। যারা এই দুই সন্ত্রাসকে এক করে দেখায়, তারা আদতে বুশ-শ্যারন সাম্রাজ্যবাদী জোটের ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেরই দালালি করে।

ভারতের শ্রেণীসচেতন শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ বুঝবেন যে, ভারতের শাসনব্যবস্থাকে আসলে চালায় যারা, সেই ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী না চাইলে, বিজেপি'র সাধ্য ছিলনা আমেরিকা-ইজরায়েলের সাথে এভাবে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তোলার। তাই, কেবল বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরাই নয়, অপর প্রধান বুর্জোয়া দল কংগ্রেসের নেত্রীও শ্যারনের সাথে বৈঠকে বসেছেন। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের সময়ই ইজরায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায় ভারত, '৯২ সালে নরসিংহ রাওয়ের আমলেই ইজরায়েলের সাথে ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

আমেরিকার সাথে নানা সামরিক চুক্তি ও ইজরায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এভাবে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় 'সুপার পাওয়ার' হিসাবে দাঁড়াতে চাইছে। আমেরিকার কাছে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী দাবি করছে বিশ্বের বাজারে ব্যবসা ও পুঁজি খাটিয়ে মুনাফার আরও সুযোগ। বিনিময়ে আমেরিকা ও ইজরায়েল চায়, ভারতে তাদের অস্ত্রের ব্যবসা, পণ্যের ব্যবসা আরও বাড়াতে, ভারতের মাটিতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে। এর ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপ যেমন আরও বাড়বে, অর্থনৈতিক দিক থেকে কী হবে তার পরিচয় কোকাকোলা-পেপসি কাণ্ড দিয়েই বোঝা যায়। জনগণকে বিষাক্ত পানীয় খাওয়ানো হচ্ছে জেনেও সরকার ঐ দুই কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নিলনা। তাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রত্যেকটি মানুষের আজ গণহত্যাকারী আরিয়েল শ্যারনের ভারত সফরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া কর্তব্য।

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত সংলগ্ন কাজিপাড়া এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং এস ইউ সি আই-এর প্রবীণ কর্মী ডাঃ নিত্যগোপাল পাল গত ২৫ আগস্ট সকাল ৮-৩০টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

মানবিক হৃদয়বৃত্তির অধিকারী ডাঃ পাল ছিলেন এলাকার জনগণ বিশেষ করে গরিব সাধারণ মানুষের সুচিকিৎসার একান্ত ভরসাস্থল। আর্ত মানুষের সেবায় তিনি কী পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করতেন তার প্রমাণ তিনি অন্তিম সময়েও রেখে গেলেন। মৃত্যুর দিন সকালে তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও রোগী দেখতে যান। রোগী দেখা এবং ব্যবস্থাপত্র লেখা শেষ হলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কোন চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কলকাতার রাজাবাজার এলাকায় চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার সময়েই সত্তর দশকের গোড়ার দিকেই তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। তারপর আমৃত্যু তিনি নিজেকে দলের আদর্শ এবং কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত রেখেছিলেন। ভাষা-শিক্ষা আন্দোলন, আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ আন্দোলন প্রভৃতি কাজে তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।

অস্ত্র কিনতে ১৫ হাজার কোটি টাকা

চারের পাতার পর

ওখানে যুদ্ধও লাগাচ্ছে বা যুদ্ধ যুদ্ধ আবহাওয়া তৈরি করছে। ভারত সরকারও দুবেলা বলছে টাকা নেই, কিন্তু খরচ কমানোর প্রশ্নে সামরিক খাতে খরচ কমানোর কথা বলছে না, সেখানে খরচ বাড়াচ্ছে। অথচ, ছাঁটাই করছে শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ জনকল্যাণমূলক অন্যান্য খাতে।

ভারত সরকারের সামরিক খরচ

৯০-৯১	১৫৪২৬ কোটি টাকা
৯৯-২০০০	৪৫৬৯৪ কোটি টাকা
০৩-০৪	৭৬৯৩২ কোটি টাকা

(সূত্র বিভিন্ন বছরে বাজেট)

৯০-৯১ থেকে ২০০০-০১ — এই দশ বছরে, টাকার মূল্যহ্রাসকে হিসাবে নিয়ে, দেখা গেছে সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে ৬৬.৮ শতাংশ (সূত্র ঃ আসপেক্টস অব ইণ্ডিয়ান ইকনমি সংখ্যা ৩০-৩১) অস্ত্র কেনার জন্য আরও বাড়ানো হচ্ছে লাফ দিয়ে।

অস্ত্র কেনার খরচ

২০০১-০২	১২০০০ কোটি টাকা
২০০২-০৩	১৬২০০ কোটি টাকা

এ বছর বাজেট বরাদ্দের ওপর একদিনে মঞ্জুর হয়েছে ১৫০০০ কোটি টাকা।

ভাবলে অবাক হতে হয়, বছরে ১০,০০০ কোটি টাকা খরচ করলে চার বছরে দেশের সব মানুষকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়, অথচ টাকা নেই এই অজুহাতে তা করা হচ্ছে না। জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারটা রাজ্যের হাতে ছেড়ে কেন্দ্র দায়িত্ব খালাস করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্য সরকারই অর্থাভাবের দোহাই দিয়ে হাসপাতালে চার্জ বাড়াচ্ছে। চিকিৎসা করা গরিব এমনকি মধ্যবিত্তের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে পড়ছে। স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় ক্রমাগত কমানো হচ্ছে। বর্তমানে জাতীয় আয়ের মাত্র ০.৯ শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। কয়েক বছর আগেও এই ব্যয় ছিল জাতীয় আয়ের ১.৩ শতাংশ (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার, বিবেক দেবরায়ের প্রবন্ধ, ৫.৯.০৩)। ২০০২-০৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক খাতে ব্যয় করেছে ৬৫০০০ কোটি টাকা, অথচ ওই বছর মোট ভরতুকি ছিল ৩৯৮০৯ কোটি টাকা, যার সিংহভাগই দেওয়া হয়েছে শিল্প ও কৃষি পুঁজিপতিদের। খুবই ছিটেফোঁটা ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে, তাও এখন তারা ছাঁটাই করতে চায়। অথচ অস্ত্র কিনতে তাদের কার্পণ্য নেই।

বিদেশি শত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষার যুক্তিও কার্যত অচল। সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত দেশ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে, তাদের সামরিক শক্তি ভারতের তুলনায় কম। তাছাড়া শত্রু দু'রকম, দৃশ্য ও অদৃশ্য। অশিক্ষা, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, রোগ প্রভৃতি অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিবছর মারা যায়। শুধু বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে কলেরা হয়ে বা আর্সেনিকের বিষে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবছর মরছে। অভাবী মানুষ স্ত্রী পুত্রের মুখে দুটো ভাত দিতে না পেরে, স্ত্রীপুত্র কন্যাকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়। খবরের কাগজের এক কোণে দুলাইন এ সংবাদ প্রায়ই থাকে। অজানা থেকে যায় আরও অনেক ঘটনা। দেশের কোটি কোটি মানুষের পরণে শতছিন্ন কাপড়টুকু ছাড়া কিছু নেই। এদের বাঁচাবার কোন দায় নেই সরকারের, কারণ সরকার জনগণের নয়, মালিকদের।

শিলিগুড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের তুঘলকি নীতির বিরুদ্ধে ঘেরাও করে দাবি আদায়

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের শিলিগুড়ি শাখা বিদ্যাচক্র কলোনির কয়েকজন বিদ্যুৎগ্রাহকের নামে ১০ হাজার, ৮ হাজার, এমনকি ২৪ হাজার টাকা পর্যন্ত বিল পাঠায়। এর প্রতিবাদে বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা) শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হলে বিদ্যুৎ দপ্তরের এস-ই ও ডি-ই বলেন, তাদের কিছু করার নেই। তবে কিস্তিতে এই টাকা গ্রাহকরা দিতে পারবেন।

পরবর্তী সময় কয়েকজন বিদ্যুৎ গ্রাহকের একই ধরনের বিল হওয়া সত্ত্বেও তাদের ট্যারিফ বেনিফিট দিয়ে যার ১০ হাজার টাকা বিল তাকে ৫ হাজার টাকা দিতে বলা হয়। পূর্বের গ্রাহকদের ট্যারিফ বেনিফিট দেওয়া হল না অথচ পরবর্তীক্ষেত্রে কিছু গ্রাহকদের তা দেওয়া হল, পর্ষদের এই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে ৩০ আগস্ট বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতি ডি-ই'কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভের চাপে এসই ও ডিই এই পক্ষপাতিত্বের কথা স্বীকার করেন, এবং গ্রাহক সমিতিকে প্রতিশ্রুতি দেন, পূর্বে যাদের ট্যারিফ বেনিফিট দেওয়া হয়নি তাদেরও ট্যারিফ বেনিফিট তাঁরা দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল, সুজিত নিয়োগী, লক্ষ্মী সরকার, পল্টু সাহা, চন্দন বসাক, কমল বিশ্বাস, সবিতা শর্মা প্রমুখ।

শিক্ষাসংকোচন করে জনগণের উৎপাদনশীলতাই খর্ব করতে চাইছে সরকার

পাঁচের পাতার পর

সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। তাদের যুক্তি দুটো ঃ (এক) প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রদের উপস্থিতির হার কম ; (দুই) পাশের হার কম। যে রাজ্যে ৫০ শতাংশ নিরক্ষর, ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হওয়া ছাত্রের ৭০ শতাংশ যেখানে দারিদ্র্যের কারণে পড়া ছেড়ে দেয় ক্লাস এইটের মধ্যেই, ৪ শতাংশ মাত্র উচ্চতর শিক্ষায় যায় তেমন এক রাজ্যে এই তো হল শিক্ষার প্রশ্নে সরকারি দায়বদ্ধতা! লক্ষণীয় পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক পদক্ষেপটি এ জিনিসেরই একটা প্রাথমিক উদ্বোধনী সংস্করণ। "আশানুরূপ" সাফল্যের মানদণ্ডে দশের গুণিতক হারে স্কুলের অনুমোদন বাতিল হওয়ার বিপদ আজ বাস্তব সমস্যা। সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনার একটা অংশ হিসাবে শিক্ষাসঙ্কোচনের জন্যই এই ষড়যন্ত্র। প্রাথমিক স্তরে জাতীয় শিক্ষানীতির সূত্র ধরেই বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা ধার নিয়ে তৈরি হয়েছে ডি পি ই পি স্কীম। তাতে বলা হয়েছে, পাঠ্যপুস্তকগুলো বিনাপয়সায় প্রাথমিক স্তরে যেন না দেওয়া হয়। সেগুলো ছাপার দায়িত্ব দিতে হবে ব্যবসায়ীদের হাতে, ছাত্রদের পয়সা দিয়ে তা কিনতে হবে। শিক্ষা যেন বইয়ের ব্যবসা বাড়াতে মদত দেয়।

ডি পি ই পি'র আওতায় এসেছে যে রাজ্যগুলো — তাদের ২০ হাজার ৭০০ শিক্ষকদের বেতনও সংগ্রহ করতে হবে স্থানীয়ভাবে ও শিক্ষার ব্যয়ভারের দায়িত্ব থাকবে গ্রামভিত্তিক কমিটির হাতে। টাকা আসবে কি উপায়ে কোথা থেকে? তার উত্তরে স্কীমের গাইডলাইনে বলা হয়েছে, দুভাবে টাকা তুলতে হবে ঃ (এক) শিক্ষার জন্য নতুন ট্যাক্স চাপিয়ে;(দুই) বেতন চাপিয়ে। আর ব্যয়ভার কমাতে হবে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে, অর্থাৎ সকলকে পাশ করিয়ে দিয়ে। 'কারণ শ্রেণীতে ফেল করা ছাত্র থাকলে, তা আর্থিক ক্ষতি বাড়িয়ে দেয়।'

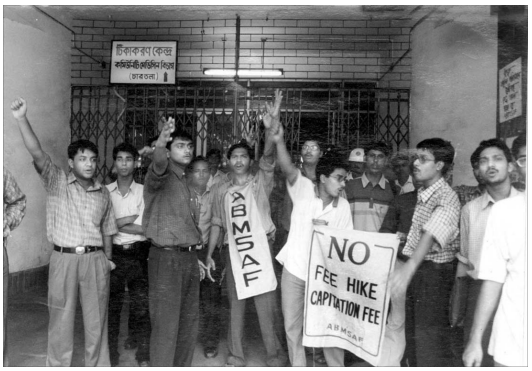

(বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট) বিশ্বব্যাঙ্কের শর্তে ছাত্র ফেল করা আর্থিক ক্ষতি বলেই ফেল করানো চলবে না। বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্টে আরও বলেছে ঃ কেউ বলতেই পারে, শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিচারে পাশ-ফেল প্রথা না থাকা ভুল হলে এটা চালু করা হবে কেন? কিন্তু এটা করতে হবে, কারণ এক ক্লাসে পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা ছাত্র পিছু খরচ কমানোর পদ্ধতি।..... (প্রাথমিক শিক্ষা — বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট)।

ঠিক এই কারণেই দেশি-বিদেশি মালিকদের দল ও সরকারগুলি কেউ অষ্টম শ্রেণী, এমনকি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এখন পাশ-ফেল তুলে দিতে চাইছে। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিয়ে এ ব্যাপারে পথ দেখিয়েছে। যদিও সকলেই এসব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হিসাবে "শিক্ষার বিস্তার", "সার্বজনীন অধিকার"-এর গল্প শুনিয়েছে। শিশুমনের ওপর চাপ কমানোর রূপকথার গল্প শুনিয়ে পাশফেল তুলেছে সি পি এম সরকার। প্রাথমিক শিক্ষাকে বেসরকারি করে দেওয়ার স্কীম ডি পি ই পি'কে তারা শিক্ষা প্রসারণের পরিকল্পনা হিসাবে তুলে ধরে সর্বনাশ করছে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাও থাকবে না একদিন। তা হয়ত দূর ভবিষ্যত নয়।

উচ্চস্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতির পথ বেয়ে মাধ্যমিকেও ছাত্রবেতনের কথা উঠেছে রাজ্যে। শিক্ষানীতির কর্ণধার আজ শিক্ষাবিদরা নন — কর্ণধার শিল্পমালিকরা। এ জন্য তৈরি হয়েছে এন এ এ সি (ন্যাক) ১৯৯৪ সালে, বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগেই। তারা ক্ষমতায় এসে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এন এ এ সি'র অধীন করার নির্দেশ দিয়েছে। এখন বলা হয়েছে, এন এ এ সি'র আবশ্যিক অনুমোদন সাপেক্ষেই সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তার বিষয়টা নির্ভর করবে। বিজেপি চালিত সরকার শিক্ষাবিদদের বাদ দিয়ে শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত করেছে — দুইজন শিল্পপতি নিয়ে। ২০০০ সালে এই কমিশন রিপোর্ট দিয়েছে।

শিক্ষাসংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্টে মোদ্দা কথা যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, "কাজের বাজারের সাথে সম্পর্কের ও চাহিদার বিচারে বিভিন্ন এজেন্সির মূল্যায়নের ভিত্তিতে সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তার বিষয়টা বিবেচনা করা হবে।"

ইউ জি সি'র ৭০-এর দশকের ঘোষণা মত শিক্ষিত বেকার কমানোর জন্য শিক্ষাসঙ্কোচনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাজারভিত্তিক শিক্ষা এবং খোদ শিক্ষাকেই বাজারের মহার্ঘ পণ্যে পরিণত করে লাভ করার পরিকল্পনা।

বেসরকারীকরণের সাফাই দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সকলেই "অর্থসঙ্কটের" দোহাই তুলছে।

এই অর্থসঙ্কটের দোহাইটা কিন্তু মিথ্যাচার। দুঃখের বিষয়, বহু সৎ সাধারণ নাগরিক এমনকি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ পর্যন্ত অর্থসঙ্কটের যুক্তি মেনে নিচ্ছেন। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অর্থের জোগানের দায় সরকারকে একশ ভাগই বহন করতে হবে — এই দাবিতেই সোচ্চার ছিলেন নবজাগরণের প্রবক্তারা এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ। শিক্ষার বরাদ্দ বাড়লে লাভ হয় সমাজের। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ফেরত আসে বহুগুণ হয়ে।

মানুষের সৃষ্টি করার শক্তি ও ক্ষমতাবৃদ্ধির — এক কথায় মানুষের উৎপাদনবৃদ্ধির ক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। ভাবগত জগতের বিকাশ বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টির পথও বিকশিত করে। তথ্যপ্রমাণেও তা স্বীকৃত। উচ্চশিক্ষিত মানুষ মানেই উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন মানুষ। সম্পদ ও মূল্য — দুটোই শ্রমের ফল। দক্ষ শ্রম মানে অধিক সম্পদ এবং আরও অধিক সম্পদ সৃষ্টিরও উপায়। ১৯২টি দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা সম্বলিত রিপোর্ট (১৯৯৫) অনুধাবন করে বাংলাদেশের অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম লিখেছেন ঃ "বিশ্বে মোট সম্পদে বিভিন্ন ধরনের পুঁজির অবদান হল ভৌতপুঁজি ১৬ শতাংশ, প্রাকৃতিক পুঁজি ২০ শতাংশ, মানব ও সামাজিক পুঁজি ৬৪ শতাংশ; অর্থাৎ যেকোন দেশে সম্পদ সৃষ্টিতে মানব ও সামাজিক পুঁজির ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের তেমন কোন বিকল্প নেই। সেই কারণেই মানব সম্পদ গঠনে শিক্ষার বিকল্প কোন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলা যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে পরিকল্পিত বর্ধিত সম্পদ বিনিয়োগ শেষমেশ দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে বড় ধরনের অবদান রাখে। তাই পৃথিবীতে আজ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি আসন দখল করে নিয়েছে।" (শিক্ষাবার্তা মে, ১৯৯৮)

বিশ্বব্যাঙ্কের প্রধান পাণ্ডার দেশ খোদ মার্কিন মুলুকে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ থিওডর শুলট্‌জ্‌ বহুকাল আগে তার গবেষণায় তিনটি সত্য স্বীকার করেছিলেন ঃ (এক) গত তিন দশকে ১৯৫৭ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার জন্য যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ইত্যাদির তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান অধিকতর। (দুই) ১৯০৯ থেকে ১৯২৯ সাল সময়কালে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা যে ভূমিকা পালন করে সে তুলনায় বর্তমানে শিক্ষার ভূমিকা অনেক বেশি। (তিন) ১৯২৯ থেকে ১৯৫৯ এই সময়কালে শিক্ষার অবদান দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিকতর ছিল। [Theodore W Shultz : The Economic Value & Education, P. 88, New York, Colombia Press 1963]

১৯২৯ - ১৯৫৭ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ২১ ভাগই ছিল শিক্ষার অবদান — এই সত্য কথাটারও স্বীকৃতি পাওয়া যায় মার্কিন

অর্থনীতিবিদ এডওয়ার্ড ডেনিসনের গবেষণাপত্রে।

সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির পীঠস্থানের অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় স্বীকৃত সত্যের মূল্য এটাই যে, শিক্ষা উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। সুতরাং অর্থনৈতিক সঙ্কটের ধূয়া তুলে শিক্ষায় বরাদ্দ ছাঁটাই অবৈজ্ঞানিক ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। আসলে সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ আজ আর উৎপাদনের অবাধ বিকাশ ঘটাতে পারেনা। এটা তাদের শিক্ষা সংকোচনের একটা বড় কারণ। তাই আজ আমেরিকা সহ সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশেই শিক্ষায় বরাদ্দ ছাঁটাই করে — শিক্ষার বেসরকারীকরণ হচ্ছে, বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গেই আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের গবেষণার কথাও আলোচনা করব। সমাজতন্ত্রের শোষণহীন অর্থনীতি উৎপাদনের অবাধ বিকাশের দ্বার খুলে দিয়েছিল। এ সময় লেনিনগ্রাদে ধাতুশিল্পে একদল কর্মরত শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শিক্ষার ভূমিকার উপর গবেষণা করেন সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ এস জি স্ট্রুমিলিন। কী হল পরীক্ষানিরীক্ষার ফল? দেখা গেল, (এক) মাত্র এক বছরের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সাধারণ সাক্ষরতা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করল। অন্যদিকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর রেঞ্চ বা লেদ মেশিন-চালকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক বছরের কর্মকালীন শিক্ষা তাদের কর্মদক্ষতা এবং উৎপাদনবৃদ্ধি করে মাত্র বছরে ১২ থেকে ১৬ শতাংশ। (দুই) সম্পূর্ণ নিরক্ষর শ্রমিকের চেয়ে চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের উৎপাদন ক্ষমতা ৪৩ শতাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের ১০৮ শতাংশ এবং উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তদের ৩০০ শতাংশ বেশি। তিনি আরও দেখান, ১৯৬০ সালে মোট জাতীয় আয় (তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে) ১৪৫ বিলিয়ন রুবল। এই আয়ের ২৩ শতাংশের উৎস মূল হল জনগণের উন্নতমানের শিক্ষাযোগ্যতা। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে বস্তুগত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫৫.৭ বিলিয়ন রুবল থেকে ১৭৪ বিলিয়ন রুবল-এ, অর্থাৎ বৃদ্ধি ৩০০ শতাংশ। একই সময়ে শিক্ষায় বিনিয়োগের বৃদ্ধি হয় ৩২৯ শতাংশ।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার অগ্রগতির ফলে জাতীয় উৎপাদন প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৬২৬ শতাংশ, ছয়গুণেরও বেশি। সামাজিক সম্পদ সৃষ্টিতে বিনিয়োজিত পুঁজির উপর লাভের হারের দৃষ্টিকোণ থেকে — অর্থাৎ তা কতটা সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি করল — শিক্ষায় বিনিয়োগের লাভই সবচেয়ে বেশি। এই লভ্যাংশ ১৯৪০ সালের ৫২ শতাংশ থেকে ১৯৬০ সালে ১৪৪ শতাংশে উঠে আসে। মস্কো রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের রেক্টর ভি এ জামিন স্ট্রুমিলিনের গবেষণা পদ্ধতির ভিত্তিতে শিল্প-কৃষিতে ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালের প্রবর্তিত বেতনের ভিত্তিতে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন, ১৯৬২ সালের জাতীয় আয়ের ২৭ শতাংশ এসেছে শিক্ষার বিনিয়োগ ও তার ফলে শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নতি থেকে।

জাপানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরিচালিত সমীক্ষাতেও দেখা যায়, ১৯৬০ সালে শিক্ষায় বিনিয়োজিত পুঁজি বস্তুগত পুঁজির ১৮ শতাংশ ছিল। কিন্তু শিক্ষার বিনিয়োগ থেকে সম্পদসৃষ্টিতে প্রাপ্তলাভ আনুপাতিক হারে অধিক ছিল। ১৯৩০ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত জাতীয় আয়ের বর্ধিত অংশের ২৫% ছিল শিক্ষায় বিনিয়োজিত মূলধনের অবদান। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে, শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দের দ্বারা সকলের জন্য শিক্ষা ও সবার জন্য উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দিলে বিপুল সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনার পথই উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাই, সৃষ্টি শক্তির এই মহান উদ্বোধনের প্রয়োজনকে 'অর্থনৈতিক সঙ্কটের" অজুহাত তুলে অস্বীকার করা ভ্রান্ত, অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক। রাষ্ট্র ও সরকার শিক্ষা সংকোচন করে,

আটের পাতায় দেখুন

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৬ বর্ষ / ৬ সংখ্যা

কমরেড আশা ব্যানার্জী লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুর পুরসভায় এস ইউ সি আই-এর একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড আশা ব্যানার্জী গত ২১ আগস্ট জয়নগরের দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বার্ধক্যজনিত নানা অসুখে তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলা নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা স্বাস্থ্যসদনে গিয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানান।

স্মরণসভা

দলের পুরসভা কমিটির পক্ষ থেকে ৩১ আগস্ট পি সি পাল ইন্সটিটিউশন হলে কমরেড আশা ব্যানার্জীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের কর্মী সমর্থক-দরদী ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে হল ছাপিয়ে যায়। কয়েকশত মানুষ হলের বাইরে ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য কমরেড রেণুপদ হালদার। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

কমরেড আশা ব্যানার্জীর ছবিতে সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর পক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন কমরেড সুধীর ব্যানার্জী। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সভার সভাপতি ও প্রধান বক্তা। জেলা এম এস এস-এর পক্ষে শ্রদ্ধা জানান সম্পাদিকা কমরেড দীপ্তি সরকার। পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটি, জেলার বিভিন্ন লোকাল কমিটি, আঞ্চলিক এম এস এস, ডি এস ও এবং কমসোমল-এর পক্ষ থেকে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করা হয়। 'শান্তি সংঘ' ও 'সৃজনী'র পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়। প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী শারীরিক অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত থাকতে না পেরে, একটি লিখিত শ্রদ্ধার্ঘ পাঠান। সভায় সেটি পাঠ করে শোনান কমরেড দীপ্তি সরকার।

প্রধান বক্তা কমরেড ইয়াকুব পৈলান কমরেড আশা ব্যানার্জীর স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর

লিখিত বক্তব্য থেকে কমরেড আশা ব্যানার্জী সম্পর্কে সব কথা আপনারা জানতে পারলেন। ১৯৫৩ সালে বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি প্রথম আশা ব্যানার্জীকে দেখি। মাঝে মাঝে যখন জয়নগরে আসতাম কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা করতে, তখন তাঁর বাড়ি যেতাম। কমরেড শচীন ব্যানার্জী আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, এলাকার শ্রদ্ধেয় নেতা। তাঁর ঘরের অভাব-অনটনের খোঁজ রাখতাম না আমরা। তাঁর সংসারের অবস্থা ছিল করুণ। বৌদি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে সংসার চালাতেন। এখানেই কমরেড আশা ব্যানার্জীর স্বামী, দল ও বিপ্লবের প্রতি যে আনুগত্য, তা বুঝতে পারি।'

সভায় কমরেড সুধীর ব্যানার্জীও বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

কমরেড আশা ব্যানার্জীর বৈপ্লবিক স্মৃতির উদ্দেশ্যে

কমরেড নীহার মুখার্জীর শ্রদ্ধার্ঘ

সুদীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ২১ আগস্ট কমরেড আশা ব্যানার্জী জয়নগরের দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের সূচনা হয়েছিল ১৯৫০-এর দশকে। হাওড়া জেলায় দলের কর্মী হিসাবে নিয়মিত কাজ শুরু করার পর তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন। তখনকার দিনে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন মহিলা আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সে সময় মহিলাদের ঘরের বাইরে এসে সক্রিয় রাজনীতি করার পথে প্রতিবন্ধকতা ছিল বহু। কমরেড শিবদাস ঘোষ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদেরও তখন নিয়মিত থাকা-খাওয়া-পরার সংস্থানই ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে সেদিন আমাদের দলের মহিলা কর্মীদের যে কী কঠিন সংগ্রাম করে দলের পত্র-পত্রিকা বিক্রয়, অর্থ সংগ্রহ অভিযান ও অন্যান্য কাজ করতে হত, সেকথা আজকের কর্মীদের পক্ষে ধারণা করাই দুরূহ।

হাওড়া জেলায় কাজ করার পরে, দীর্ঘদিন কমরেড আশা ব্যানার্জী কলকাতার তারক প্রামাণিক রোডের পার্টি কমিউনে থেকে কলকাতা জেলার অধীনে কাজ করেছেন। এখানে থাকাকালীনই আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

এর বেশ কিছুদিন পরে পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে জয়নগরে পাঠানো হয়। জয়নগরে দলের কাজ করতে গিয়েও তিনি নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। তাছাড়া আর্থিক অনটন ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ইতিমধ্যে তাঁর একটি সন্তান হওয়াতে অর্থসঙ্কট চরম হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে তিনি জয়নগরের একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষিকার চাকুরি নেন। এর কিছুদিন পরেই তাঁর দ্বিতীয় সন্তান শ্যামলীর জন্ম হয়। এই শিশুকন্যাটির যখন তিন-চার বছর বয়স, তখন কমরেড আশা ব্যানার্জী তাকে একটি চটের বস্তায় শুইয়ে বেঞ্চির সঙ্গে বেঁধে স্কুলে চলে যেতেন। একটি পাত্রে খাবার এবং আরেকটি পাত্রে জল রেখে যেতেন। এই খাবারে কুকুর বিড়ালও মুখ দিত। শ্যামলী এইভাবে ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। আমি তখন পার্টির ফিনান্সের দায়িত্বে। আমি তার চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারিনি। শিশুটি বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এই ঘটনার পরে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা কমরেড আশা ব্যানার্জীকে শুধু নির্মম রূঢ় গঞ্জনা দিয়েছে তাই নয়, এই কটু শ্লেষ পর্যন্ত করেছে যে "সন্তানের চিকিৎসা করাতে না পারলে বিয়ে করেছিলে কেন"। কমরেড আশা ব্যানার্জী এসবই নীরব ও নির্লিপ্তভাবে সহ্য করেছেন।

এই যে অসাধারণ সহনক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, তার মূলে ছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা, চরিত্র ও স্নেহের অত্যন্ত গভীর প্রভাব। সেই সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য, গভীর স্নেহ ও বিপ্লবী শিক্ষা দিয়ে একদিকে যেমন একটি একটি করে কর্মী তৈরি করেছিলেন, তেমনই দলের সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে একটি আনন্দময়, খোলামেলা ও সত্যিকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক এবং গোটা দলের মধ্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামের সহায়ক একটা প্রাণবন্ত পরিবেশের জন্ম দিয়েছিলেন। শুরু থেকেই কমরেড আশা ব্যানার্জী দলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার দ্বারা এবং দলের এই আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকার দ্বারা এই সহনক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন। এই সংগ্রামই ছিল তাঁর শক্তির উৎস।

তিনি যে সুদীর্ঘকাল ধরে কর্মক্ষম ছিলেন, ততদিন এক একনিষ্ঠ ও নীরব কর্মীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়েই ছিলেন। তাঁর সেই দিনগুলোতে যাঁরা তাঁকে দেখেননি, তাঁরা হয়তো এই কথার সবটা অনুধাবন করতে পারবেন না।

কমরেড আশা ব্যানার্জী লাল সেলাম

সরকার আবার ভাড়া বাড়াতে পারে, জনগণ রুখে দাঁড়ান

এস ইউ সি আই-এর আবেদন

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির মিথ্যা যুক্তি তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে তেল কোম্পানিগুলি অন্যায়ভাবে তেলের দাম বাড়াচ্ছে। রাজ্য সরকার আবার তার উপর সেস ও কর বসিয়ে অতিরিক্ত রাজস্ব তুলছে। এর ফলে তেলের দাম যা বাড়ছে, তার বোঝা বার বার রাজ্য সরকার বাসভাড়া বৃদ্ধি করে জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। এবারও সেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মানুষের দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা কোন সরকারেরই তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের মৌখিক বিরোধিতা করছে, বাস্তবে একে রুখবার জন্য দেশব্যাপী যে আন্দোলন দরকার সে ব্যাপারে কিছুই করছে না।

ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ১.৩১ টাকা বৃদ্ধির ফলে মালিকদের মুনাফা কিছু কমবে, কিন্তু ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এবারে ভাড়া বাড়ানোর জন্য বাস মালিকদের থেকেও সরকারি তৎপরতা বেশি দেখা যাচ্ছে।

আমাদের দাবি ঃ

* ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিকে অজুহাত করে আবার ভাড়া বাড়িয়ে মালিকদের অতিরিক্ত লাভের ব্যবস্থা করা চলবে না।
* গত বছর বর্ধিত ভাড়ার সঙ্গে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের নামে আদায় করা অতিরিক্ত ৯% ভাড়ার কয়েক কোটি টাকা যাত্রীদের ফেরত দিতে হবে। এই টাকা দিয়ে যাত্রীকল্যাণ তহবিল গঠন করতে হবে।
* রোড ট্যাক্স, পারমিট ফি, লাইসেন্স ফি ইত্যাদি বাড়ানো চলবে না।
* তেলের উপর রাজ্য সরকারের সেস এবং কর প্রত্যাহার করতে হবে।
* ভাড়া নির্ধারণের জন্য যাত্রী প্রতিনিধি সহ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে।
* বাস শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা, পি-এফ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করতে হবে।

একমাত্র জনগণের সক্রিয় প্রতিরোধই পারে আবার অন্যায় ভাড়াবৃদ্ধিকে রুখে দিতে। সরকার যদি আবার ভাড়া বাড়ায়, যাত্রী কমিটি গড়ে তুলে তা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা জনগণের কাছে আবেদন করছি।

শিক্ষাসংকোচনের নতুন কৌশল

সাতের পাতার পর

বেসরকারীকরণের মাধ্যমে শিক্ষাকে মহার্ঘ পণ্যে পরিণত করে ৯৮ শতাংশ গরিব ও সাধারণ মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে আসলে জনগণের সৃষ্টিশীলতা, উৎপাদনশীলতাকেই খর্ব করতে চাইছে শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে মানুষের কর্মক্ষমতা কাজে লাগানোর পথ যে শুধু সঙ্কুচিত হয়েছে তাই নয় — কর্মশীল শিক্ষক, শ্রমিক-কর্মচারীকেও কর্মচ্যুত করছে, লক্-আউট, লে-অফ, ছাঁটাই হয়েছে অবাধ। স্বেচ্ছাবসরের নামে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিদায় করা হচ্ছে লাখে লাখে মানুষকে। তাদের শ্রমকে ব্যবহার করার পক্ষে পুঁজিবাদী অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র-সরকার আজ অপারগ। উৎপাদনের যোগ্যতা অর্জনের অনুশীলনের একটা প্রধান ক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে অগণিত ছাত্রকে। ড্রপ আউটের ফলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিরাট শ্রম-উৎকর্ষতার সম্ভাবনাময় শক্তি হয়ে পড়ছে পঙ্গু ও অলস। পুঁজিবাদ চায় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যন্ত্রচালক — সঙ্কুচিত বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে যা লাভজনক। নির্মম সত্যটা হল এই যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন নীতি ও উদ্দেশ্যের ফলে বস্তুগত উৎপাদন যেমন উদ্বৃত্তের সমস্যায় জর্জরিত, তেমনি ভাবগত উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উদ্বৃত্তের সমস্যা। উৎপাদনশীলতার উৎস যাবতীয় শ্রমই আজ উদ্বৃত্তের সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। এই সমস্যার তীব্রতাই খোদ শিক্ষাকেই আজ মুনাফা অর্জনের পণ্য হিসাবে ভাবতে শিখিয়েছে। গড়ে উঠছে শিক্ষা-ব্যবসার ক্ষেত্র। সম্পদ চাই, সমৃদ্ধি চাই বলে প্রচার তুলে সম্পদ-সমৃদ্ধির উৎসমূলে কুঠার মারছে — শিক্ষার বরাদ্দ নজিরহীন ছাঁটাই করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। সে কারণে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের যুক্তভাবে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শ্রমজীবী জনতাকে শ্রেণীসংগ্রাম করতে হবে আরও তীব্র। আজকের দিনে শিক্ষার অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের আন্দোলন এভাবেই শ্রমজীবী ব্যাপক শোষিত মানুষের পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের এবং বেসরকারীকরণের, বিশ্বায়নের ধারার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। শাসকশ্রেণীর আক্রমণের ধাক্কা ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক কর্মচারীদের ইতিমধ্যেই বাধ্য করছে এক মিছিলের সারিতে দাঁড়িয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে সংগ্রামের পতাকাকে তুলে নিতে।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net